





পথে বিপথে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

সূচীপত্র



শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীনীরে

মোহিনী

ফেরি-স্টীমারে অবিনের সঙ্গে অনেক বছরের পর দেখা হতেই সে আমাকে একেবারে একখানা ছবি দেখিয়ে বললে, 'দেখতে পাচ্ছ ?' তোমার-আমার মতো হলে প্রথম প্রশ্ন হত, 'তুমি কে হে ?' বা, 'তোমাকে তো চিনলেম না !' কিন্তু অবিন, সে কোনোদিনই আমাদের মতো সাধারণ-একটা-কিছু ছিল না ; সুতরাং সে আমাকে না চিনলেও, সে যে অবিন, এটার প্রমাণ পেতে আমার একটুও দেরি হল না। ছবিটার সবটা দেখলেম অন্ধকার ; কেবল নীচে একটা পিতলের ফলকে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিল 'মোহিনী'। আমি সেইটে দেখিয়ে বললেম, 'মোহিনী বুঝি ?'

অবিন খানিকটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'পেলে না। তবে শোনো !' বলেই আমাকে টেনে মাঝের বেঞ্চে বসালে। তখন শীতের সকাল ; কুয়াশা ঠেলে জাহাজখানা খুব আস্তে-আস্তে জল কেটে চলেছে। অবিন শুরু করলে—

'কলকাতায় আমাদের বাসাবাড়িখানা অনেকদিনের। এখন সেটা আমাদের বসতবাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালে কর্তারা সে-বাসাটা কেবল গঙ্গাস্নান আর কালীঘাট করবার জন্যেই বানিয়েছিলেন। খুবই পুরোনো এই বাসাবাড়ির ঘরগুলো ; ঝাড়-লণ্ঠন, কৌচ-কেদারা, ওয়াটার-পেন্টিং, অয়েল-পেন্টিং, বড়ো বড়ো আয়না এবং সোনার ঝালর-দেওয়া মখমলের ভারি-ভারি পর্দা দিয়ে যতদূর সম্ভব জাঁকালো এবং মানুষের প্রতিদিন বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে কর্তারা সাজিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে সেকালের সেই ধুলোয় ভরা, পুরোনো মদের ছোপ-ধরা, সাবেকি আতরের

গন্ধ-মাখানো, এই সব ফার্নিচার তখন কতক বিক্রি ক'রে, কতক ঝেড়ে ঝুড়ে মেরামত ক'রে, আর কতক-বা একেবারে ফেলে দিয়ে বাড়িখানাকে একালের বসবাসের মতো করে নিতে হচ্ছিল। আমি এখনো যেমন, তখনো অবিবাহিত। সেই সময় একদিন এই ছবিটা আমার হাতে পড়ল। খানিকটা কালো-অন্ধকারের রঙ লেপা; কেবলমাত্র দুটি সুন্দর চোখ, তাও অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকলে তবে দেখা যেত।'

জাহাজ এসে কাশীপুরের জেটিতে লাগল। একদল থার্ড ক্লাস-যাত্রী মাড়োয়ারি নেমে গেল, এবং তার চেয়ে আরো বড়ো একদল কলের কুলি, মিলের চীনে মিস্ত্রি উঠে এল। অবিন ডেকের এধার থেকে ওধারে একবার পায়চারি করে নিয়ে ফিরে এসে বললে—

'এই ছবিটা রাবিস্ বলে নিশ্চয়ই বউবাজারে পুরোনো জিনিসের সঙ্গে চালান যেত, কিন্তু যে-ঘরের দেয়ালে এটা খাটানো ছিল, সেই-ঘরটার ইতিহাসটা বেশ-একটু রকমওয়ারি রকমের ছিল বলেই সে ঘরটায় আমি কোনো অদল-বদল ঘটতে দিই নি। আমাদের যিনি ছোটোকর্তা তাঁরই সেটা বৈঠকখানা। এই ছোটোকর্তাই আমাদের সেকালের শেষ-ঐশ্বর্যের বাতিগুলো দিনের বেলায় ঝাড়ে-লণ্ঠনে জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন; এবং নিজের হাতের হীরের আংটির বড়ো-বড়ো আঁচড়ে বিলিতি আয়নাগুলোকে, সেই সব দিনকে রাত, রাতকে দিন করবার ইতিহাসের সন-তারিখ এবং নামের তালিকায় ভরে দিয়ে গেছেন। এই কর্তার বাবুগিরির কীর্তিকলাপের গল্প ছেলেবেলায় আরব্য-উপন্যাসের মতোই আমার কাছে লাগত; এবং বড়ো হয়ে যখন আমি এই ঘরের চাবি খুললেম, তখন গোলাপি আতর-মাখানো পুরোনো কিংখাবের গন্ধ-ভরা একটা

অন্ধকারের মধ্যে এই ছবির দুটি কালো চোখ আমার দিকে এমনি একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল যে, সে-ঘরটায় কোনো অদলবদল করতে আমার সাহস হল না। কিন্তু, সে-ঘরটাকে তালা-বন্ধ করে ফেলে রাখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। বাড়ির মধ্যে সেই ঘরটা সব চেয়ে আরামের, একেবারে ফুল-বাগানের ধারেই; দক্ষিণের হাওয়া এবং পুবের আলোর দিকে সম্পূর্ণ খোলা ঘরখানি! আমি সেইখানেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাস-মজলিস— সেকালের মতো নয়, একালের ক্লাব-রুমের ধরণে— গড়ে তুললেম। আমরা সেই সাবেক-কালের নাচঘরটায় বসে চা-চুরুটের সঙ্গে পলিটিক্স, সোসিওলজি, থিওলজি এবং জার্মান-ওয়ারের চর্চায় ঘোরতর তর্কযুদ্ধে যখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছি তখন হঠাৎ এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে আমার চোখ পড়লেই, সেকালের বিলাসিতার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে বিলাতি কেতায় আমাদের এই একালের মজলিস এত কুশ্রী বোধ হত, দুই কালের ব্যবধানটা এমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিত যে, আমাদের তর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হত না। আমাদের মনে হত, এ ঘরের স্বামী যিনি, তাঁর অবর্তমানে অনাহূত আমরা একদল এখানে অনধিকার প্রবেশ করে গোলমাল বাধিয়েছি; এখনি যেন বাবুর খানসামা এসে আমাদের এখান থেকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেবে। মনের এই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ও-ঘরখানার মধ্যে আড্ডা জমিয়ে তোলা অসম্ভব দেখে আমার বন্ধুরা বলতে লাগল, 'ওহে অবিন, তোমার, ভাই, ওই মোহিনীকে এখান থেকে না নড়ালে চলছে না; ওর ওই ভুতুড়ে-রকমের চাহনিটায় আমাদের এখানে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না দেখছি।' কিন্তু, বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষে হল না; মোহিনী যেখানকার সেইখানেই রইলেন; বন্ধুরা একে-একে সরে পড়তে থাকলেন। 'এই সময় আমার মনে হত, একালটা যেন একটা

খোলসের মতো আস্তে-আস্তে আমার চারি দিক থেকে খসে যাচ্ছে, আর আমার নিজ মূর্তিটা পুরোনো খাপ থেকে ছোরার মতো ক্রমে বেরিয়ে আসছে। আমার মধ্যে যে-সেকালটা ছিল সে যেন দিনে-দিনে প্রবল হয়ে উঠছে ; বুঝছি, আমার রক্তের সঙ্গে সেকালের বিলাসিতার গোলাপি আতর এসে মিশছে, আমার দুই চোখের কোণে উদ্দাম বাসনার অগ্নিশিখা কাজলের রেখা টেনে দিচ্ছে ! এই সময় আমি এক-একদিন এই ছবিখানার দিকে চেয়ে-চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। ওই ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে, ওই কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ তারই আলোকশিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে, আমার দেহ-মন আবেগে থর-থর করে কাঁপত ! আমার মনের এই তিমিরাভিসার বন্ধুরা পাগলামির প্রথম লক্ষণ বলে ধার্য করে নিয়ে আমাকে সাবধান করলেন, উপহাস করলেন, নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত করে ভয় দেখিয়ে শেষে আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র গমন করলেন— যেখানে চায়ের এবং চুরুটের আড্ডা ভালো জমতে পারে।

'আমি একলা ঘরে ; আর আমার মনের শিয়রে অন্ধকারের পর্দার ওপারে— মোহিনী ! যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। এ সেই সব দিনের কথা হৃদয়তন্ত্রীতে যখন মিনতির সুর অন্ধকারে লুটিয়ে পড়ে বিনয় করছে, 'এসো এসো, দেখা দাও।' একখানা ছবি, তাও আবার প্রায় ষোলো-আনাই ঝাপসা, সে যে এমন করে মনকে টানতে পারে এটা আমার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল, বন্ধুদের কথা তো দূরে থাক। বললে বিশ্বাস করবে না, তখন বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যদি আসত আমার মনে হত, ওই ছবিখানার মধ্যে যে আছে তারই যেন মাথা-ঘসার সুবাস পাচ্ছি ! হাফেজ যে সজীব ছবিটি দেখে দেওয়ানা হয়েছিলেন, তার চেয়ে

পটের অন্দরে লুকিয়েছিল যে-মোহিনী সে যে কম জীবন্ত, কম সুন্দরী, তা তো আমার মনে হত না। নীল ঘেরাটোপ-দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামা পাখি! তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে, সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা, আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা-দেওয়া বাকি!'

এতটা বলে অবিন হঠাৎ চুপ করলে। তখন আধখানা নদীর উপর থেকে কুয়াশা সরে গিয়ে জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে, আর আধখানা নদীর বুকে ভোরের অন্ধকার টল্‌টল্‌ করছে, এরই মাঝে দুই ডিঙায় দুই জেলে কালোর আলোর বুকে জাল ফেলে চুপ করে বসে রয়েছে দেখছি। আমাদের জাহাজ থেকে একটা ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে ডিঙা দুখানাকে খুব একটা দোলা দিয়ে চলে গেল। অবিন শুরু করলে—

'শুনেছিলেম তান্ত্রিক সাধকেরা নাকি মন্ত্রবলে জড়ে জীবন দিতে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলতে পারেন। আমি আমার মোহিনীকে মন্ত্রবলে কাছে, একেবারে আমার চোখের সম্মুখে, টেনে আনবার জন্য এমন এক সাধকের সন্ধান করছি, সেই সময় আমার এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে কথায় কথায় মোহিনীর ছবিটা যে কেমন করে আমাকে পেয়ে বসেছে সেই ইতিহাস উঠল। বন্ধু আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বললেন, 'তোমার দশা সেই গ্রীসদেশের ভাস্করটার সঙ্গে মিলছে দেখছি!' আমি বললেম, 'তার সামনে তো তবু তার মোহিনী প্রাণটুকু ছাড়া আর-

সমস্তটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ; কিন্তু আমার মোহিনী যে অবগুণ্ঠনের আড়ালেই রহে গেছে হে ! এর উপায় কিছু বাৎলাতে পার ?' বন্ধু আমায় উপায় বাৎলে, বাড়ি গিয়ে এক শিশি আরক আমাকে দিয়ে পাঠালেন। সেকালটা যদিও আমাকে বারো-আনা গ্রাস করেছিল, তবু মনের এক কোণে একালের বিজ্ঞানটার উপরে একটু যে শ্রদ্ধা তা তখনো দূর হয় নি। আমি বন্ধুবরের কথা-মতো ঘড়ি ধ'রে, হিসাব ক'রে সেই আরকটা সমস্ত মোহিনীর ছবিখানায় ঢেলে দিলেম। সে-আরকটার এমন তীব্র গন্ধ যে আমায় যেন মাতালের মতো বিহ্বল করে তুললে। তার পর কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছি, তা মনে নেই। এইটুকু মাত্র জানি যে, আরক ঢালবার পরে মোহিনীর ছবিখানা ধোঁয়ায় ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে, আর আমি ভাবছি, এইবার মেঘ কাটল।

'একমাস পরে কঠিন রোগশয্যা থেকে শেষে নিষ্কৃতি পেয়ে আর একবার ছবিখানার দিকে চেয়ে দেখলেম, সেটার উপর থেকে সেই চাহনিটা সরে গেছে ; কেবল তার নামটা আঁটা রয়েছে, সোনালি ফলকে, বড়ো বড়ো অক্ষরে !'

তখন শিবতলার ঘাটে জাহাজ লেগেছে, আমি তাড়াতাড়ি অবিনকে নমস্কার করে নেমে চলেছি, এমন সময় সে সজোরে আমার হাতে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, 'ওহে আর্টিস্ট, মোছে নি হে, ভয় নেই। ছবিখানা পটের গভীর থেকে গভীরতর অংশে গিয়েই আমার অন্তর থেকে অন্তরতম স্থানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।'

অস্থি

হঠাৎ সে-কদিন জাহাজের ডেকে, ক্যাবিনে, পন্টুনে এবং টিকিট-ঘরে বাদল-পোকার ঝাঁকের মতো কেন এত সি-আই-ডি'র আবির্ভাব হল এবং কেনই বা দেখতে-দেখতে একদিন তারা গা-ঢাকা দিয়ে এ-তল্লাট ছেড়ে গেল, তা বলা শক্ত। কিন্তু, তারা অদৃশ্য হবার অনেক দিন পর পর্যন্ত জলে স্থলে আকাশে, জাহাজের ডেকের তক্তাগুলোর ফাটলে ফাটলে, বসবার বেঞ্চগুলোর তলায় তলায়, এমন-কি স্টীমারের চিম্‌নির কালো ধোঁয়ার আড়ালে পর্যন্ত কতকগুলো যমদূতের মতো আল্‌ফা-বেটার উপসর্গের ছড়াছড়ি যে দেখছিলেম, সেটা আমি বেশ বলতে পারি। বড়োবাজার থেকে সাতটা-পঞ্চাশের স্টীমারের ফার্স্ট-ক্লাসের সব-আগের দুটো বেঞ্চির কোণে নষ্টামি, ভাঁড়ামি; গাঁজাখুরি গল্প, যাত্রা, গান, কবীর এবং তুলসীদাসের পদাবলী দিয়ে আমরা দিব্যি একটি কুঁড়েমির নীড় বেঁধে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা আরামে কাটাচ্ছিলেম ; উপসর্গের উৎপাতে যখন আমাদের সে নীড় ভাঙো-ভাঙো— গানও জমছে না, গল্পও প্রায় বন্ধ— ঠিক সেই-সময় একটা লোক, তার চক্‌চকে কালো ইরানি টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুস্তিন আর সোনা-বাঁধা গেঁটে-বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল এবং ঠিক তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমার-কোম্পানি আমাদের আগের জাহাজ-খানা বদলে, আকাশের দিকে নাক-তোলা, ঘুপ্‌সি এবং অতিরিক্ত-রকম কম-চওড়া ও অধিক-লম্বা স্টীমার বড়োবাজারের ঘাটে এনে হাজির করলে। তখন আমি সে-লোকটাকে শেমুষি বলে স্থির করে নিতে একটুকু দেরি করলেম না, যদিও অবিন তাকে গির্‌গিটির

চেয়ে উচ্চপদ দিতে মোটেই রাজি হয় নি।

এই জাহাজখানায় চড়ে আনাগোনা করছি বটে কিন্তু এখানার *সবই আমাদের অপরিচিত খট্‌মটে ঠেকছে। এটার বয়্‌লারগুলো কেল্লার বুরুজের মতো লোহার চাদরে ঢাকা; এটার খালাসি থেকে* সারেঙ-সুগনী সবাই যেন গোরাদের চুরুটের এবং মদের একটা উৎকট গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাদের দৃষ্টিই নেই। আর, মকরের শুঁড়ের মতো আগা-তোলা সেই ফার্স্ট ক্লাসের ঘুপ্‌সি ডেক— সেখানে বসে গঙ্গাও দেখা যায় না, আকাশের নীলও চোখে পড়ে না, মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা হাঙরের পেটের ভিতর বসে চলেছি— তার উপর সেখানে অবিনের ওই পুস্তিন-পরা মানুষটি! আমরা ক'টি ঝোড়ো-কাকের মতো নিজের নিজের ডানায় মুখ লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় কেল্লার একটা খুব বড়ো ইংরেজ, জার্নেল কি কার্নেল হবে, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ইউনিফার্‌মের উপরে পালক-দেওয়া টুপি এবং থোপ্‌না-বাঁধা তলোয়ার ঝুলিয়ে জাহাজে উঠেই সেই লোকটাকে দেখে বললে, 'হ্যালো, তুমি যে এখানে?'

লোকটা অতি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর করলে, 'আমি এখানে, কেননা আমার যাবার আর কোথাও বাকি নেই। এই জাহাজ-খানা আমি পোর্ট-কমিশনারদের বেচে ফেলেছি কিন্তু এর মায়াটা এখনো কাটাতে পারি নি, তাই এটায় চড়ে তুই-সন্ধ্যা বেড়াই। এখানা এক বছর গার্ডেন-রীচের ওই দিকে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই ডায়মণ্ড-হার্‌বারে যাওয়া-আসা করছিল, এদিকের একখানা জাহাজ বে-কল হওয়ায় এরা এটাকে এখানে এনেছে। জাহাজের সঙ্গে আমিও দক্ষিণ থেকে উত্তরে, ব্রীজের ওপার থেকে এপারে এসে পড়েছি; তোমার সঙ্গে দেখা হল, সুখী হলেম।'

তখন কাশীপুরের গন্‌ফাউণ্ডারির ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়ছে, সাহেব সেই লোকটাকে টাইম কী জিজ্ঞাসা করলে। সে জেব থেকে একটা প্রকাণ্ড ম্যাকেব-ওয়াচ বার করে বললে, 'আটটা পঞ্চাশ।' ঘড়িটা আগাগোড়া হীরেয় মোড়া এবং তার চেনটা সমস্তটা পান্না আর চুনি -গাঁথা। সকালের আলো সে-দুটোর উপরে পড়ে বিদ্যুতের মতো ঝক্‌ করে উঠল। সাহেব গুড্‌মর্নিং বলে কাশীপুরে নেমে গেল। সেই লোকটা অন্যমনস্ক ভাবে সেই ঘড়ি আর চেন দুই আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আপনার মনে বিড়-বিড় করে কী বকতে লাগল।

কারো কাছে কিছু নতুন দেখলে অবিন সেটাকে অন্তত ঘণ্টা-খানেকের জন্য কেড়ে না নিয়ে থাকতে পারে না জানতেম ; কিন্তু, সে আজ যে এমনটা করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সাহেব নেমে যেতেই অবিন হঠাৎ সেই লোকটার হাত থেকে ঘড়ি মায়-চেন ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে দিয়ে গট্‌ হয়ে বসল ; আমার মনে হল, যেন একটা আগুনের সাপ অবিনের বুকের পকেটে গিয়ে লুকুল। লোকটা কী মনে করছে এই ভেবে আমার দুই কান লাল হয়ে উঠেছে ; অবিন কিন্তু দেখি, চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে। আর, সেই লোকটা একটু নড়ল না, চড়ল না, অবিনের দিকে ফিরেও দেখলে না, উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে যেমন ছিল তেমনি রইল ; আর দেখলেম, তার দুটো আঙুল ঘড়ি-চেনটা নিয়ে যেমন ঘুরছিল এখনো তেমনি আস্তে আস্তে শূন্যে ঘুরছে। কড়া কথা, মিষ্ট কথা, মিনতি এবং বিনতি সব যখন হার মেনেছে, তখন আমি অবিনকে বললেম, 'তোমার সঙ্গে এই পর্যন্ত।' বলেই আমি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসলেম। কতক্ষণ এমন কাটল মনে

নেই। একটা সাদা পাখি ঢেউয়ের উপর, পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়িটির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে, আমি সেই দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় অবিন আমার পিঠে একটা মস্ত থাবড়া বসিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললে, 'ওহে, পকেট থেকে চেনটা কোথায় পড়ল দেখেছ?'

সাপে ছোব্‌লালে যেমন, আমি তেমনি চমকে উঠলেম; দেখলেম, ভয়ে অবিনের মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমার দুই চোখ চকিতের মতো ডেক্‌টার এক ধার থেকে আর-এক ধার যেন ঝেঁটিয়ে নিলে। শিরিস-কাগজ-করা সেগুন-কাঠের সরু তক্তাগুলো এবং পিচ-ঢালা তাদের জোড়ের সেলাইগুলো এমন অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে কোনো দিন আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি। অবিনও তার পায়ের কাছে জমা-করা জাহাজের মোটা কাছিটা যেন আন্‌মনে পা দোলাতে দোলাতে একটুখানি সরিয়ে দেখলে এবং বুক থেকে হঠাৎ-খসে-পড়া গোলাপফুলটা কুড়োবার অছিলায় বেঞ্চের তলাটাও একবার বেশ করে হাত বুলিয়ে নিলে বটে কিন্তু কোথাও সেই ঘড়ি বা তার সাপ-খেলানো চেনের লেজুড়ের ডগাটি পর্যন্ত নেই! এদিকে দেখছি, কুঠিঘাটার পন্‌টুনে, মৌমাছির ঝাঁকের মতো লোক জাহাজটা ধরবার অপেক্ষায়। আর-একটু পরেই লোকের পায়ের তলায় অবিনের এই মহামূল্য বিপদ গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে, এটা ভেবে আমার লজ্জাও যেমন হচ্ছে, তেমনি আর-একটু পরেই অবিনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারব, ভেবে খানিকটা ফুর্তি এবং সাহসও হচ্ছে। এমন সময় সেই লোকটা বেশ ধীরে-সুস্থে বেঞ্চি থেকে উঠে বরাবর থার্ড্‌ ক্লাসে ইঞ্জিন-ঘরের ধারে লালপাগড়ি একজন রিভার-পুলিশের জমাদারের সঙ্গে কে জানে খানিকটা কী ফুস্‌-ফাস্‌ করে আবার আস্তে আস্তে নিজের জায়গা এসে দখল করলে। কুঠিঘাটায় তখন লোক উঠতে শুরু হয়েছে। পাহারা-

ওয়ালা-সাহেব ফাস্ট ক্লাসে আসবার রাস্তাটা আগলে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন ছোকরা টিকিট-কালেক্টারের সঙ্গে ফিস্-ফাস্ করে কী যে বলাবলি করতে লাগল তা শুনতে পেলেম না ; অবিনও চোখ বুজে কী ভাবতে লাগল তা আমি জানি না ; কিন্তু আমি আমার দুই পকেটে হাত গুঁজে বুট জুতোর সুক্তলা থেকে মাথার উপরে টুপি-ঢাকা ব্রহ্ম-তেলো পর্যন্ত একটা শীত-শীত অনুভব করতে লাগলেম। জাহাজ পুরো-দমে কলকাতার দিকে চলেছে, তার সমস্তটা একটা রুদ্ধ আবেগে থর্থর্ করে কাঁপছে ; যেন সে আমাদের যত শীঘ্র পারে বড়োবাজারের পন্টুনে হাজির করলে বাঁচে—যেখানে নিকেলের বোতাম-আঁটা কালো কোর্তা গায়ে সাহেব-কন্স্টেবল কটা চোখের স্থির দৃষ্টিটা নিয়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এমন সময় অবিন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখুন তো আপনার ঘড়িতে কটা।' সমস্ত পৃথিবী ক্ষণকালের জন্য চলা-বলা বন্ধ করে আমার দুই চোখের চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সেই লোকটার দিকে যেন চেয়ে দেখলে। লোকটা তার জেব থেকে সেই হীরের ঘড়ি মায়-চেন হারানিধির মতো অবিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, 'দশটা বিশ হল।' ঝমাঝম্ বাদলা হঠাৎ কেটে সূর্য উঠলে যেমন সব পাখিগুলো একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তেমনি জাহাজের যাত্রীদের কোলাহল, কলের হুস্-হাস্, জলের কল্-কল্, সমস্ত একসঙ্গে এসে আমার মনের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে ; অবিন যে কখন উঠে সেই লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আহিরিটোলায় নেমে গেল তা আমি দেখতেও পেলেম না।

আমাদের কুঁড়েমির বাসাটা ভেঙে গেছে। অবিন আর আসে না ; যদিও কোনোদিন আসে তো ঘড়ি ধরে বাড়ি ফেরে। অবিনের

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নবীন এবং প্রবীণের দল একে একে গা-ঢাকা হল ; পড়ে রইলেম কেবল আমি— নবীন ও প্রবীণ দুই দলেরই অবশেষ, উল্টে-পড়া মদের পেয়ালায় তলানি একটি ফোঁটা !

ইয়ার্কির শেষ-নাড়িচ্ছেদ বুড়ো গোলোকবাবুর সঙ্গে সম্পূর্ণ করে আমি আমার সেই আগেকার জাহাজে আজকের সকালে ঠিক সেই আগেকারই মতো একলাটি এসে বসেছি। এতদিন যেন শীতে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে আগুন-তাতে বাস করছিলেম, হঠাৎ আজ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখছি, বসন্তকাল জলে স্থলে ঢেউ দিয়ে বইছে। মন-ভোলানো ফাগুনের হাওয়া, বসন্তবাউরির সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হলদে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে। আমি তারই দিকে চেয়ে একলাটি আমার সেই আগেকার জায়গায় চুপ করে বসে বসে দেখছি— সব নৌকোয় ফুটো-ফাটা নতুন-পুরাতন-নির্বিশেষে পালগুলোতে আজ নতুন দখিনে হাওয়া বেধেছে, নদীর বুকে যৌবনের জোয়ার তুফান তুলেছে, জলের ফেনা যেন ফুলের সাদা সাজ ! বাইরের এই শোভার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে, আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আছি, এমন সময় একটা প্রাণখোলা পরিষ্কার বাতাস নদীর এক আঁজ্‌লা ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টায় আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে সমস্ত ডেকটা একবার জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ধুয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলাপফুলের খোস্‌বো চারি দিকে ছড়িয়ে সেই হাঙরমুখো স্টীমারের লোকটি বাসন্তী রঙের একখানা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে দেখা দিলেন। লোকটির চেহারা যে এত সুন্দর ইতিপূর্বে তা আমার চোখেই পড়ে নি। আজ গোলাপি সাটিনের সদ্‌রি, বাসন্তী রঙের ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মস্‌লিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজ-করা হাল্কা টুপিটি প'রে

মূর্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে। সিংহের মতো সরু কোমর আর দরাজ বুক নিয়ে লোকটি আমার পাশেই এসে বসলেন। আমি তাঁকে একটা সেলাম না দিয়ে থাকতে পারলেম না। তিনি একটুখানি হেসে আমার দিকে একবার ঘাড় নিচু করে চাইলেন। সেই সময় তাঁর চোখদুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা! এমন চোখ আমি কারু দেখি নি ; এ যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে বটে, দেখছে নাও বটে! তখন সেই আচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টি, সেই বাসন্তী কাপড়ের আভা, আর সেই রুমালে-ঢালা গোলাপফুলের রঙ আমাকে এমন বিহ্বল করেছে যে আমার মনে পড়ে না তাঁকে আমি কোনো প্রশ্ন করেছিলেম কি না। তিনি যেন আমার প্রশ্নেরই জবাবে বললেন, 'তবে শুনুন—

'আমার বংশে কেউ কখনো স্বপ্ন দেখত না। এটা শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন না। পাঁজরের যে হাড়খানায় স্বপ্নের বাসা, সেই হাড়টা হাফেজের মতো কোনো মহাকবির অভিশাপে আমাদের আদিপুরুষের বুক থেকে খসে পড়েছিল, সেই থেকে বংশানুক্রমে আমরা ভয়ংকর-রকম কাজের মানুষ হয়ে জন্মাতে লাগলেম। বুকের ওই হাড়, যেটাকে স্বপ্ন এসে বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে তোলে, সেটা আর আমাদের কারু মধ্যে গজাতে পেল না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে-দক্ষতার একটা শিলমোহর বুকে নিয়েই যেন আমাদের বংশের সব ছেলেগুলো ভূমিষ্ঠ হত এবং আমাদের মধ্যে কোনো ছেলের বুকে যদি কখনো ওই হাড়ের বাঁশির অঙ্কুরমাত্র আছে এরূপ সন্দেহ হত, তবে হাকিম এবং বুজরুগ ডেকে সেই শিশু-বুকে একটা তপ্ত লোহার শলা চালিয়ে স্বপ্নের অঙ্কুর দগ্ধ করে দিতে আমাদের কেউ কোনোদিন ইতস্তত করেন নি, যদিও স্বপ্নের সন্দেহে অনেক সময় শিশু-প্রাণগুলি পুড়ে ছাই হতে বিলম্ব হয় নি। আমাদের যারা

কেউ নয়, তারা এজন্যে হাহাকার করত, এবং এর জন্যে আমাদের বংশে অনেক মায়েরও বুক ফাটত সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো পিতার তাতে একনিমিষের জন্য কাজে একটু শৈথিল্য এসেছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। পুরুষানুক্রমে কাজ থেকে রস টেনে নিয়ে আমাদের বুকের হাড়গুলো বাজ-ধরবার শিকের মতো সরু, কালো এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল।

'এই বংশের শেষ সন্তান আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলেম তার ছ মাস পূর্বে পিতা আমার স্বর্গারোহণ করেছেন এবং আমায় প্রসব করে মা আমার কঠিন রোগশয্যায় শুলেন, কাজেই আমার বুকের ভিতরে স্বপ্নের বাঁশি যদি থাকে সেটা নিয়ে আমি বেড়ে উঠতে কোনো বাধাই পেলাম না। শুকনো ডালের শেষ-পল্লবের মতো আমি, আমার মধ্যে দিয়ে হয়তো এই অভিশপ্ত বংশের অসংখ্য বিফল স্বপ্নগুলো শেষ ফুলটির মতো একদিন ফুটে উঠতেও পারে, এই ভেবে মা আমার এক-একদিন রোগশয্যার কাছে আমাকে ডেকে তাঁর শীর্ণ হাতখানা আমার বুকের উপর আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেখতেন। সে-সময় তাঁর দুই চোখ রোগের কালিমার মাঝে এমন একটা উৎকট আশঙ্কা নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত যে আমি ভয়ে এক-একদিন কেঁদে ফেল্‌তুম। মা আমার চোখে জল দেখে আরামের একটা নিশ্বাস ফেলে আমায় ছেড়ে দিতেন। আমাদের বংশে কেউ কোনোদিন চোখের জল ফেলে নি, সেটাকে তাঁরা স্বপ্নের অঙ্কুরের মতো সম্পূর্ণ অকেজো বলেই গণ্য করতেন।

'মা দুঃসাধ্য রোগে বিকল; কাজেই সেই অল্পবয়স থেকেই আমি কাজের মানুষ হয়ে উঠলুম। কাজের চাপনে আমার সমস্ত বুকটা যখন কলের চাপে পাটের গাঁটের মতো নিরেট শক্ত হয়ে ওঠবার জোগাড়, যে-সময় কাজের মধ্যে আমি এমন-একটু অবসর

পাচ্ছি নে যে রোগা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে একটুও সময় নষ্ট করি, যখন মা আমার অসময়ে হঠাৎ মরে অসমাপ্ত কাজের কোনো ব্যাঘাত না ঘটান এই প্রার্থনাটা আমার মনে নিত্য জাগছে, সেই সময় পাটের বাজারে একটা বিষম দাঁও-প্যাঁচের মাঝখানে মায়ের আসন্ন মৃত্যুর খবরটা আমার অফিস-ঘরে এসে পৌঁছল। বলা বাহুল্য, সেখান থেকে আমার কাজ অসমাপ্ত রেখে তখন নড়বার সাধ্য ছিল না। যে-সাহেবের সঙ্গে সেদিন দেখা, তিনি তখন আমাদের ডাক্তার ছিলেন। আমি একখান চির্‌কুটে আমার কাজ সেরে আসা পর্যন্ত তাঁকে মায়ের খবরদারি করতে লিখে পাঠিয়ে কাজে মন দিলেম। আর-কেউ হলে সব কাজ ফেলে মুমূর্ষু মায়ের কাছে ছুটে যেত কিন্তু আমি জানতুম, আমি সেই নিরেট বাঁশের শেষ কঞ্চি, বাঁশি হয়ে বাজা যার পক্ষে অসম্ভব!

'কাজ চুকিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশটা হল এবং বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে জলযোগ করে নিতে আরো খানিকটা সময় অতীত হল। আমি যখন মায়ের ঘরে গেলেম তখন রাত গভীর হয়েছে। মাকে যে জীবন্ত দেখতে পেলেম সেজন্য আনন্দ হল না; তিনি যে আমার কাজ সারা হবার মাঝেই সরে গিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটান নি, সেটাতেই আমার আনন্দ। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে বললেন, 'ওই বাক্সটা এখানে আন্‌।' বাক্সটা তাঁর সমুখে ধরে দিতেই তিনি কী-একটা বার করে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'তুই কখনো স্বপ্ন দেখিস?'

'বাক্সটার ভিতর আমি দেখলেম শূন্য। আমার মনে হল মায়ের কথার কী উত্তর দেব সেইটে শোনবার জন্যে সেই লোহার বাক্সটা যেন হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে বললেম, 'কোনো পুরুষে স্বপ্ন কাকে বলে জানি

নি!' আমার মনে হল, আমার কথা শুনে মায়ের বুকের ওঠা-পড়া হঠাৎ বন্ধ হল, তার পর আস্তে আস্তে তাঁর ডান হাতের মুঠো সজোরে কী যেন আঁকড়ে ধরলে।

'তার পর যা ঘটল সেটার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না। একটা ঝড় যেন প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিয়ে আমার ভিতরে জমাট-বাঁধা কাজকে হঠাৎ ঠেলে বার করে দিলে। আমার পাঁজরের সমস্ত হাড়গুলো তল্‌তা বাঁশের বাঁশির মতো করুণ সুরে সহসা বেজে উঠল। আর, আমার সেই মরা মায়ের ডান হাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকের উপর থেকে উঠে ক্রমে ক্রমে আমার বুকের উপরে এসে আস্তে আস্তে আপনার মুঠো খুললে। তার ভিতর রয়েছে দেখলেম, 'আব্‌দ্‌ আল্লা' লেখা আমার অভিশপ্ত অতি-পুরাতন পূর্বপুরুষের বুকের হাড়! তার গায়ে সাত-আটটা ছোটো ছোটো ফুটো। সেইদিন সব-প্রথম লোকে আমাদের বাড়ি থেকে কান্নার করুণ সুর শুনতে পেয়েছিল। আর সেইদিন আমি প্রথম জানতে পারলেম, আমার বুকের ভিতরে সব হাড়গুলো বাঁশির মতো ফাঁপা ও ফুটো, কাজ দিয়ে সেগুলো বোজানো ছিল মাত্র—'

গঙ্গার একটা জলের ঝাপটা হঠাৎ স্টীমারের ডেক্ ডিঙিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা জলের ছিটেয় একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আমি হঠাৎ চমকে উঠে চারি দিক চেয়ে দেখলেম, একটা গোলাপ-ফুল আমার পাশে পড়ে আছে; কিন্তু, সে লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তার পরদিন অবিনের সঙ্গে দেখা হতে সে বললে, 'ওহে কাল কি তুমি স্বপ্নে ভোর ছিলে? পাশের স্টীমার থেকে গোলাপ-ফুলটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারলেম, তাতেও তোমার চৈতন্য হল না! অবাক্!'

গুরুজি

আজ অবিনের গুরুর কাছে সে আমাকে নিয়ে যাবে। শুনেছি, তিনি মহা সাধুপুরুষ এবং জাতিস্মর। আমি সেদিন আমার গেরুয়া মলিদার ওভার-কোট্টার উপরে আজ-কালের স্বামীজির ধরণে পাগড়িটা বেঁধে, পকেটে কবীরের পুঁথিখানা নিয়ে, জাহাজে গিয়ে চড়লেম। নাকে সোনার চশমা এবং হাতে রুপো-বাঁধা শুয়োরের দাঁতের ছড়ি আর পায়ে ফ্লানেলের পেণ্টালুনের নীচে ব্রাউন-লেদার বুট্টায় আমাকে ফকির কি ফিকিরবাজ পুলিসের সি-আই-ডি অথবা আর-কিছু দেখাচ্ছিল তা আমি ঠিক বলতে পারি নে; তবে আমার মনের ভিতর সেদিন যে একটু গেরুয়ার আভা পড়েছিল, এবং আমি গান-বাজনা না করে খুব গম্ভীর হয়ে বসে থাকায় জাহাজের তাবৎ যাত্রী আমার দিকেই যে থেকে থেকে কটাক্ষপাত করছে, এটা আমি বেশ বুঝছিলেম। বুড়ো গোলোকবাবু সেদিন খবরের কাগজটা চশমার অতটা কাছে নিয়ে কেন যে অমন মনঃ-সংযোগ দিয়ে জুটের বাজার-দরের কলম্টা আগাগোড়া মুখস্থ করছিলেন, সেটা জানতে আমায় অধিক কষ্ট পেতে হয় নি।

যাই হোক, অন্যদিনের মতো সেদিনও নিয়মিত উত্তরপাড়ায় এসে জাহাজ ভিড়ল। অবিনে-আমাতে সেখানে নেমে পড়ে থার্ড এবং ফোর্থ এই দুই ক্লাসের মাঝামাঝি গড়নের ছক্কড় গাড়িতে ধুলো এবং ঝাঁকানি খেতে খেতে আধক্রোশ-টাক্ গিয়ে রাজাদের একটা বাগান-বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি ঘোড়া, মায় গাড়োয়ান এবং আমরা দুজনে, খানার ভিতরে উলটে পড়লেম। একখানা মোটর-গাড়ি একরাশ ধুলো আর খানিক পেট্রোলের বিকট গন্ধ আমাদের

নাক-চোখের উপরে ছড়িয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। অবিন সেই পলায়িত মোটরের চলন্ত ধুলোর মধ্যে আরো গোটাকতক ইংরেজি গালাগাল মিশিয়ে দিয়ে আমাকে চাকাভাঙা গাড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমার চশমার একখানা কাঁচ গেছে ভেঙে, পাগড়িটা গেছে খুলে, এবং শুয়োরের দাঁতটা খসে গিয়ে আমার লাঠিটা হয়ে পড়েছে ফোগ্‌লা। অবিন আমার চেহারা দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। আমি গায়ের ধুলো যথাসম্ভব ঝেড়ে-ঝুড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম, সে যেমন ফিট্‌-ফাট্‌ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেমনি আছে ; তার কালো কোটের একটি ভাঁজও এদিক-ওদিক হয় নি এবং তার বুকের মাঝে ফুটন্ত গোলাপ-ফুলটি থেকে একটি পাপড়িও ঝরে পড়ে নি। অবিন লম্বায় চওড়ায় আমার চেয়ে বেশি বই কম হবে না, অথচ ওই ছক্কড় গাড়িটার খাঁচাকল থেকে কী করে এমন সাফ বেরিয়ে গেল তা জানি নে ; কিন্তু তাকে দেখে আমার হিংসে হয়েছিল সত্যি বলছি। ধুলোমাখা গেরুয়া-পাগড়ি ঝেড়ে-ঝুড়ে সাম্‌লে নিলেম বটে কিন্তু বাড়িতে আয়নায় দেখে দেখে যেমন চোস্ত করে সেটাকে বেঁধেছিলেম তেমনটা আর হল না ; ব্রহ্মতেলোর মাঝখান থেকে কাপড়ের ফুঁপিটা সাপের ফণার মতো আর উদ্যত হয়ে রইল না, বাঁ-কানের উপরে লট্‌কে পড়ল ; এবং এই আকস্মিক দশা-বিপর্যয়ে দেহটা অনেকখানি ধুলো মেখে নিলেও, মন তার নিজের গেরুয়া রঙটুকু আর বজায় রাখতে পারলে না। অবিনের সঙ্গে সেই রাজার বাড়িতে সাধুদর্শনে যখন প্রবেশ করলেম তখন মন আমার সম্পূর্ণ অসাধু এবং অধীর।

রঙ-ওঠা লোহার শিক-দেওয়া একটা ফটকের মাঝ দিয়ে ইঁটের খাদ্‌রি-করা চওড়া একটা রাস্তা খানিক সোজা গিয়ে বেড়ির মতো

ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে টালি-বসানো একটা বারান্দার চার ধাপ সিঁড়ির নীচে গিয়ে শেষ হয়েছে ; রাস্তাটায় এক কালে লাল সুরকি ঢালা ছিল, এখন সেগুলো উড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় সবুজ শেওলার ছোপ ধরেছে। রাস্তার ধারে ধারে পুরোনো গোটাকতক পাটা-ঝাউ এবং এখানে-ওখানে মাটির পরী রাখবার গোটা-তুচ্চার ইঁটের পিল্লে। পরীগুলোর মাটির দেহ বারো-আনা ক্ষয়ে গিয়ে ভিতরের শিকগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বাগানটা বাড়ির পিছন পর্যন্ত ঘুরে গিয়ে, একটা টানা রেলিঙের ভিতর দিয়ে যেখানে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে সেইখানে একসার শুকনো গাঁদাফুলের গাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির তুধারে সিংহি বসবার তুটো বড়ো চাতাল। একটার উপর থেকে সিংহি অনেক কাল পালিয়েছে— সেখানে একটা ছেঁড়া মাতুর রোদে শুকোচ্ছে ; আর-একটা চাতালে পোড়ামাটির মুখ খিঁচিয়ে এখনো এক পশুরাজ ভোম্বলদাস তার খসে-পড়া ল্যাজের সরু শিকটা আকাশের দিকে খাড়া করে থাবাহীন এক পা শূন্যে উঁচিয়ে বসে আছে।

আমরা সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে মোটা মোটা তিনটে থাম-দেওয়া বারান্দা পেরিয়ে এক বড়ো ঘরে ঢুকলেম। ঘরটা খুব লম্বা, মাঝে বাঘ-থাবা পুরোনো মেহগ্নি-কাঠের মস্ত একটা গোল টেবিল অনেকখানি ধুলো আর খুব জমকালো একটা চিনে-মাটির ফুলদান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলদানটার একটা হাতোল আর খানিকটা কানা ভাঙা ; আর তার গায়ে বড়ো বড়ো গোলাপ-ফুল, প্রজাপতি আঁকা। ঘরের ঝাড় ক'টা ময়লা গেলাপ দিয়ে মোড়া— আগে লাল, এখন কালো সালু-মোড়া শিকে ঝুলছে। ঘরের সবুজ খড়-খড়ি ছিল ; এখন ফিকে হতে হতে দাঁড়িয়েছে প্রায় গঙ্গামৃত্তিকার রঙ। ঘরের পাশের দেয়ালগুলোতে একটা করে আয়না, একটা

মেমের ছবি— ছবির কোনোটার কাপড়-পরা, কোনোটা নয়। মাঝের দুই বড়ো দেয়ালে এক দিকে একটা বড়ো ঘড়ি ; আর-এক দিকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধা, জরির তাজ মাথায়, এক সুপুরুষের চেহারা— মনে হচ্ছে, যেন সামনের দেয়ালে সেই অনেক-দিনের-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কাঁটা দুটোর দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

অবিন ঘরে ঢুকেই বাঁকা-পায়া গোল-পিঠ পাঁচরঙা ফুল-কাটা ছিট-মোড়া একখানা চৌকিতে ধপাস করে বসে পড়ল। দুজনে প্রায় এক কোয়ার্টার বসে আছি ; অবিনের মুখে কথাই নেই। আমরা কেন যে এখানে এসেছি সেটা যেন অবিন ভুলেই গেছে। আমি বেগতিক দেখে— একটা উড়ে ঘরের এক টেরে, যেখানে খানিক রোদ এসে পড়েছে, একটা সিগারেটের মরচে-ধরা টিনের কৌটো থেকে দোক্তার পাতা একটা একটা বার করে রোদে মেলিয়ে দিচ্ছিল— সেইখানে আস্তে আস্তে গিয়ে বললেম, 'সাধু কোথায় রে ?' উড়েটা ঘাড় না উঠিয়েই, সাধু এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করেই আবার নিজের কাজে মন দিলে। আমি আবার বললেম, 'ওরে, সাধু কোথায় ? তাঁকে একবার খবর দে না !'

দাসো একবার পানের দাগ-ধরা লাল ঠোঁট দুটো কুঁচকে বললে, 'সাধু ? আমিই তো সাধু !'

আমার আর রাগ বরদাস্ত হল না ; আমি আমার ভাঙা ছড়ি-গাছটার বাকি অংশটা তার পিঠেই আজ ভেঙে যাব বলে উঁচিয়েছি আর অবিন ডাকলে, 'ওহে, এদিকে।' ফিরে দেখি যাঁকে দেখবার জন্যে আসা তিনি দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হবামাত্র তিনি একটুখানি হেসে কবীরের এই পরখটা সুর করে আউড়ে নিলেন—

'মন ন রঙ্গায়ে, রঙ্গায়ে যোগী কাপ্‌ড়া।'

আমার পকেটে কবীরের পুঁথি, এটা ইনি নিশ্চয় জেনেছেন ; আর, কথাগুলো আমাকেই বলা হল, এই ভেবে আমি একটু বিস্মিত, একটু ভীত, আর একটু লজ্জিত হয়েই তাঁর পায়ে প্রণাম করলেম। তিনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'ওহে অবিন, তোমার বন্ধু যবনের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন, এটা তো ভালো হল না !'

ইনি যবন ! বিস্ময়ে আমি যেন অভিভূত হয়ে অবিনের দিকে চাইলেম। মনে একটু যে ঘৃণার উদয় না হয়েছিল তা নয়। অবিনটা তার পাৎলা ঠোঁট খুব চেপে এবং বড়ো বড়ো চোখে প্রকাণ্ড একটা কৌতুকের নিঃশব্দ হাসি নিয়ে আমার মুখে চেয়ে রইল। আমার তার উপর ভারি রাগ হচ্ছিল ; সে যদি আগে বলত তো যবনের পদধূলি— কথাটা মনে আসবামাত্রই সাধু একেবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

'কোই রহীম কোই রাম বখানৈ, কোই কহে আদেস,
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল ঢুঁর ফিরে চঁহু দেশ।'

আমার বেশটার উপরে এই ঠেস— সেটা যিনি করলেন তিনিও যে ভেকধারী কেউ নন, এটা তাঁর সাদা সিল্কের পাঞ্জাবির উপরে কাশ্মীরি শাল এবং তার নীচে লুঙ্গি-ফ্যাশানে পরা নূতন ধোয়া থান ধুতি দেখে কিছুতেই আমি ভাবতে পারলেম না। এমন সাধু আমি অনেক দেখেছি এবং সময়ে সময়ে তাদের পাল্লায় পড়ে অনেক ঠেকেও শিখেছি। আমি একটু চেঁচিয়েই অবিনকে বললেম, 'চলো হে, জাহাজ আবার না ছেড়ে দেয় ! সাধুদর্শন হল ; চলো এখন গঙ্গাস্নান করে বাড়ি যাই।'

অবিনের যিনি গুরু, তিনি এতক্ষণে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'এই এতক্ষণে আপনি আমায় যথার্থ চিনেছেন।

আসুন, একটু চা আর গোটা-দুই মুর্‌গির ডিম না খাইয়ে আপনাদের ছাড়া হচ্ছে না।'

বলা বাহুল্য, যবনের পদধূলিতে ঘৃণা থাকলেও, যবনপালিত পক্ষীজাতির উপরে আমার কোনো আক্রোশ ছিল না। জেলের জল শাস্ত্র-মতে অগ্রাহ্য বলে জেলের মাছও যে বাদ দেব এমন মূর্খ আমি ছিলেম না; বা জেলখানার ছত্রিশ-জাতের গায়ের বাতাস মনুর মতে নিষিদ্ধ হলেও জেলের তেল অথবা সেই তেলে ভাজা শহরের ছত্রিশ-জাতের পদধূলি-মাখানো গরম ফুলুরি যে অনাদরের সামগ্রী এটা স্বীকার করতে আমি একেবারেই নারাজ ছিলেম। তার পর সদ্য-ধোপ-দেওয়া সাদা চাদরে ঢাকা টেবিলে যখন অতিবিশুদ্ধ তামার কোষা কমণ্ডলু তাম্রকুণ্ডতে টাটকা-পাড়া মুরগির সাদা ডিম, এবং তার চেয়েও পরিষ্কার এবং সাদা পাঁউরুটি, ঘরের গোরুর দুধ, লিপ্‌টনের চা-পানি— কলের জলের, গঙ্গাজলের নয়—এসে উপস্থিত, তখন অবিনের গুরুকে সাধুবাদ দিতে একটুও আমায় ইতস্তত করতে হল না।

ফকিরটির ভিতরে ফক্‌রেমি কোথাও ছিল না। দেখলেম, তাঁর হাতের চিমটেয় তিনি তিনটে পাখির খাঁচা ঝুলিয়েছেন এবং তাঁর গেরুয়া-বসনটা টুকরো-টুকরো করে কেটে তিনি বানিয়েছেন খাঁচার ঢাকা; পৈতের সুতোয় তিনি বানিয়েছেন ঘুড়ি ওড়াবার সরু লক; লক্ষ্মীর ঘটটা উলটে তিনি সরস্বতীর বীণার তুম্বি বানিয়ে নিয়েছেন। বৈরেগিদের যা-কিছু ভণ্ডামি, ও গোঁড়ামির যত-কিছু আসবাব, সবগুলোকে তিনি এমন এক-একটা অদ্ভুত কাজে লাগিয়েছেন যে সেগুলোর দুর্দশা দেখে দুঃখ না হয়ে, হাসি পাবেই পাবে। মনুসংহিতায়, বাইবেলে, কোরানে যেগুলো শুদ্ধ, সেগুলো বিরুদ্ধ-কাজে খাটিয়ে তিনি আপনার চারি দিকে এমন একটা হাস্যরসের

এবং অদ্ভুত রসের অবতারণা করে রেখেছেন যে, মন সেখানে এসে দুঃসাহসে ভরে না উঠে যায় না। আমার মনে হল, যেন বাইরের একটা পরিষ্কার বাতাস জোর করে আমার বুকের কপাট দুখানা খুলে দিয়ে গেল। এর পর যখন সেই সাধুপুরুষের দিকে চাইলেম তখন তাঁকে গুরু এবং বন্ধু এই দুই ছাড়া আমি আর-কিছু মনে করতে পারলেম না। আমি গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে লাগলুম—

'আরে ইন্‌ দুহু রাহ না পাঈ,
হিঁন্‌দুকী হিংদবাঈ দেখী, তুর্কণকী তুর্‌কাঈ।'

হঠাৎ হাতের কাছ থেকে বীণাটা তুলে নিয়ে বন্ধু আমার, গুরু আমার, তিনি গানের শেষ-চরণ দুটো পূর্ণ করে দিলেন—

'কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হবৈ যাঈ।'

তার পর তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই চলল। আমি গাই, তিনি জবাব দেন। কিন্তু আমার তেমন সুস্বরও ছিল না, আর বাজাতে তেমন দক্ষতা জন্মজন্মান্তরেও লাভ করব কি না তাও জানি নে।

সে-বেলার স্টীমার অনেকক্ষণ ঘাট পেরিয়ে আপনার ঠিকানায় যাত্রী নিয়ে পোঁছে গেছে। তখন তিনি বীণা রেখে বললেন, 'চলো, এখন স্নান করে কিছু খাওয়া যাক।'

আমি গঙ্গার দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'না, ওখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।'

এইটে তাঁর স্নানের ঘর। সাদা পাথরে মোড়া যেন একটা চাঁদের আলোর গহ্বরে এসে ঢুকলেম। মাঝে স্ফটিকের চেয়ে পরিষ্কার গোলাপ-জলের ফোয়ারা! কী বিপুল শুভ্রতার ঘাটে এই মহাপুরুষের সঙ্গে স্নানে নামলেম! যখন আমি এই কথা ভাবছি তখন একটা দাসী— তেমন সুন্দরী আমি কখনো দেখি নি— সোনার একটা পাখির খাঁচা এনে বন্ধুর হাতে দিয়ে গেল। পাখির গা'টা বাউলদের

শততালি কাঁথাখানার মতো নানা রঙে বিচিত্র। পাখিটা খাঁচার তলায় বসে ধুঁকছে। আর তার রোগা পালক-ওঠা গলাটা থেকে গোপী-যন্ত্রের শব্দের মতো গুব্‌গুব্ একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। বন্ধু সেই মুমূর্ষু পাখিটিকে খাঁচা থেকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আচ্ছা ক'রে গোলাপজলের ফোয়ারায় চুবিয়ে দাসীর হাতে একখানা সাদা রুমালের উপরে বসিয়ে দিলেন। পাখির ডানা-দুখানা সেই সাদা রুমাল ঢেকে পাঁচমিশিলি বদ রঙ-মাখানো বিশ্রী দুটো হাতের মতো ছড়িয়ে রইল। নির্জীব পাখিটার হলদে দুটো চোয়াল বেয়ে লোহার কসের মতো পাৎলা গেরুয়া রক্ত সেই রুমালখানার সাদা রঙ মলিন করে দিচ্ছে, আর মূর্তিমন্ত নিষ্ঠুরতার মতো আমাদের বন্ধু দুটো জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে সেই দিকে চেয়ে আছেন— এ দৃশ্যটা আমার কল্পনারও অতীত। আমার অন্তর-বাহির একটা বীভৎস বিস্ময়ে সেই লোকটার সঙ্গে আরো বেশি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উৎকট আকাঙ্ক্ষায় টল্‌মল্ করে উঠল। এই দেখলেম একে মহাপুরুষ, আবার এই দেখছি ঘোর নৃশংস, মৃত্যুর মতো নির্মম।

এ রহস্যের ব্যূহভেদ একমাত্র অবিনই করতে পারবে জেনে আমি তার শরণাপন্ন হলেম। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে বললে, 'আমি পারব না ; ইচ্ছা হয় তুমি ওঁকে শুধোও।'

আমার আর ভোজনে সুখ হল না, শয়নে শান্তি এল না। মহাপুরুষ উপাদেয় রকমেই আমাদের পান ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। অবিনটা দিব্যি সেগুলো উপভোগ করলে এবং বেলা চারটের সময় ফিরতি স্টীমার ধরবার জন্য ঠিক সময়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমার এ স্থানটা থেকে কিছুতেই নড়তে ইচ্ছা ছিল না। এবার আমি অবিনের ঠিক পাল্টা-জবাব দিলেম, 'আমি যাব না ; তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও।'

কত আশ্চর্য ব্যাপার চোখের উপরে ঘটে গেল, তাতে অবিনের কৌতূহল জাগে নি ; কিন্তু ওই-যে বলেছি 'যাব না', অমনি তার মনে একটু 'কেন' জাগল এবং দেখতে দেখতে সেটা একটা বিরাট কৌতূহলে পরিণত হল। সে ছড়িগাছটা আর ওভার্‌কোটটা খুলে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে শুধোল, 'নিমন্ত্রণ পেয়েছ নাকি ?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললেম, 'হুঁ।'

অবিনের কৌতূহলের আবেগ দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে একেবারে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, 'এইখানে তুমি রাত কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছ ? এ কি সম্ভব !'

'অসম্ভব কেনই বা হবে ?'

অবিন বোধ হয় আমার মুখ দেখে কতকটা এঁচেছিল আমি তাকে ভোগা দিচ্ছি। সে এবার জোরের সঙ্গে বললে, 'অসম্ভব। কেননা আমার পক্ষে সেটা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি !'

বলেই অবিন ওভার্‌কোট পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সেই মহাপুরুষ ঘরে এসে বললেন, 'যা এতদিন অসম্ভব ছিল, আজ তা সম্ভব হোক ; কী বলেন ?'

আমাদের আর দুবার করে অনুরোধ করতে হল না। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যখন তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেম তখন তাঁর হাতে হাতির দাঁতের রঙ একটা পাখি দেখলেম। সেটা পায়রা কি ঘুঘু কিছু বোঝা গেল না। আর, তাঁর পাশে যেন পাথরে-গড়া একটি সুন্দর ছেলে।

আজ পূর্ণচন্দ্র আকাশের নীলের উপরে সাদা আলোর একটা জাল বিস্তার করে দেখা দিয়েছেন। এমন পরিষ্কার ধব্‌ধবে রাত

আমি দেখি নি। তার মাঝে একটা শ্বেত-পাথরের মন্দিরে আমরা এসে বসেছি। অবিনের পরনে তার সেই নেভি-ব্লু চায়না-কোট, আমার সেই গেরুয়া অলস্টর, আর তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা সাজ। তাঁর মাথার চুল যে এত সাদা তা পূর্বে আমার চোখে পড়ে নি। যেন সাদা ফেনার মধ্যে তাঁর সুন্দর মুখ শ্বেতপদ্মের মতো দেখা যাচ্ছে। আজ কী সাদার মধ্যেই এসে আমরা ডুব দিলুম। মেঘ যখন তার সমস্ত জল ছড়িয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে উঠেছে, এ তেমনি সাদা। হিমালয়পর্বতের শিখরের তুষার যখন তার সমস্ত তরলতার সমাহার করে শুভ্র কঠিন হয়ে উঠেছে, এ তেমনি সাদা। এরই মাঝে তিনি আস্তে আস্তে তাঁর ইতিহাস শুরু করলেন—

'পূর্বজন্মে যাগযজ্ঞ দানসাগর শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণভোজন ও কুমারীদানে সর্বস্ব লুটিয়ে দেবার পুণ্যে আমি তিন ত্রিশে নব্বই লক্ষ বৎসর বিষ্ণুলোক ব্রহ্মলোক আর শিবলোকে বাস করে শেষে অমরাবতীতে ইন্দ্রত্বপদ দখল করে বসলেম। সে বারো হাজার বৎসর নন্দনবনে চিরযৌবন নিয়ে কী আনন্দ, কী বিলাসের মধ্যেই যে বাস করছিলেম তা বর্ণনাতীত। তোমরা এখানে মোগল-বাদশাহের বাবুগিরির যে-সব গল্প পড়ে অবাক হয়ে যাও সেখানকার তুলনায় সেগুলো কী তুচ্ছ! সেখানে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই; মনের বাগানে চিরবসন্তের ফুলগুলো সৌন্দর্যের সুখের লালসার মত্ততার অফুরন্ত পেয়ালার মতো রসে চিরদিন ভরপুর রয়েছে। অতৃপ্তির শিখা সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো দিনরাত জ্বলছে। স্বর্গের সেই ক'টা দিন আমার ভোগের অনলে উর্বশী রম্ভা তিলোত্তমাকে আহুতি দিয়ে প্রায় স্বর্গবাস শেষ করে এনেছি, সেই সময়ে ইন্দ্রাণীর উপরে আমার লোলুপ দৃষ্টি পড়ল। আমার কাছে অপ্রাপ্য তখন কিছুই ছিল না। আমার শেষ-পুণ্যফল একটা বিরাট

অজগরের মতো উত্তপ্ত নিশ্বাসে আকর্ষণ করে শেষে একদিন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীকে আমার তুই বাহুর মধ্যে এনে উপস্থিত করলে।

'সেই রাত্রি— সেই সুনীল আকাশের বাসর-ঘরে প্রমোদের বীণার ঝঙ্কারে নারীর ক্রন্দন, সতীর নিশ্বাসের করুণ সুর, ডুবে গেল, অশ্রুত রইল! সেই আমার স্বর্গবাসের শেষ প্রমোদরজনী, আমার চিরযৌবনের উত্তেজনার মদিরা পূর্ণমাত্রায় আমি পান করলেম। আর সেই রাত্রিপ্রভাতে ইন্দ্রদেবের অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার বৎসরের শ্রান্তি আর অবসাদ প্রথম এসে আমাকে আক্রমণ করলে।

'ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র থেকে আপনাকে রক্ষা করবার আর-কোনো উপায় ছিল না। আমি গিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেম। তিনি আমাকে একগাছা হরিনামের মালা দিয়ে বললেন, 'তুমি নিজের কর্মফলেই স্বর্গে এসেছিলে এবং তারই ফলে আবার পৃথিবীতে চলেছ; হরিনাম কর আবার এখানে তোমার স্থান হবে।'

'স্বর্গ যে কী ভয়ংকর স্থান তা আমার জানতে বাকি ছিল না। অমর-অতৃপ্তিতে আমার আর লোভ ছিল না। আমি বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার কাছে এলেম।

'তিনি তাঁর মানসপুত্রদের লেখা খানকতক সংহিতা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এতে যেমন বিধান লেখা হয়েছে সেইমতো যথাবিধানে পৃথিবীতে গিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর, স্বর্গ আবার তোমার করতলে আসবে।'

'আমি সেখান থেকেও হতাশ হয়ে দেবাদিদেবের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত নিবেদন করলেম। তিনি বললেন, 'তুমি কারও কথা শুনো না, স্বর্গলাভের সহজ উপায় আমার হাতে আছে। এই এক-টিপ সিদ্ধি মুখে ফেলে দাও, তোমাকে আর স্বর্গের ফটক

পেরিয়ে বেশি দূর যেতে হবে না; আমার দূতেরা ঝুঁটি ধরে এখানে তোমায় ফিরিয়ে আনবে।'

'আমি তখন জগৎ-জননীর পা জড়িয়ে ধরলেম। মা আমাকে কৃপা করে তিন রঙের তিনটি কপোত দেখিয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে এই তিনজন তোমার বন্ধু থাকবে। এদের চিনে নিও, তবেই জীবন তোমার শান্তিতে কাটবে। না হলে আবার এই স্বর্গবাস আর এই স্বর্গবাসের লাঞ্ছনা তোমার অদৃষ্টে ঘটবে নিশ্চয়।'

'আমি বিষ্ণুর জপমালা, ব্রহ্মার ঘেরণ্ডসংহিতা আর শিবের সিদ্ধির পুঁটুলি টেনে ফেলে দিয়ে সেই কপোত তিনটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেম। একটি নীল, একটি গেরুয়া, একটি সাদা। দেখতে দেখতে সপ্তস্বর্গ রামধনুকের রঙের মতো আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। আমি এইখানে নেমে এলেম। সেই তিনটি কপোতী হচ্ছেন—'

অবিন অমনি ফস্ করে বলে উঠল, 'বস্ গুরুজি, আর না। গল্পের ভিতর মোরালিটি ও নীতিকথা এসে মিশছে। রক্ষে করুন। এই নীল-কোট আমি, আপনার যৌবনের ইয়ার, আমিই হচ্ছি সেই নীল কপোত। মাঝে ভুদণ্ডের মতো এই গেরুয়া-কপোত আমার বন্ধু— এ আপনার দাঁড়ে বসে ছোলা খেলে এবং আপনার গোলাপ-জলের ফোয়ারার পিচ্‌কিরিতে এর ভিতরের ও বাইরের বৈরাগ্য গেরুয়া-রক্ত বমন করে স্বর্গলাভও করলে। তবে এখন আপনার পাশে শিশুবেশে যে সাদা কপোত দেখা দিয়েছেন ওঁকে নিয়েই আপনি শান্তিতে থাকুন, আমাদের আর নীতিকথা বলে দগ্ধাবেন না।'

শাণিত ছোরার উপরে আলো পড়লে যেমন হয়, মহাপুরুষের

চোখদুটো অবিনের এই ধৃষ্টতায় ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে কোমর থেকে সাপের মতো বাঁকা একখানা ছোরা বার করে অবিনের দিকে এগিয়ে চললেন। আমি চিৎকার করে অবিনকে সাবধান করতে যাব, কিন্তু কথা সরল না, সেই ছেলেটা এসে আমার গলা এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে! সেই সাদা পাখিটা ঝট্‌পট্‌ করে ডানা ঝাপটে মাথার চারি দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অবিন তার দুই ঘুষো বাগিয়ে সেই মহাপুরুষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেবলই বলছে, 'গল্পে নীতিকথা অসহ্য!'

তার পর হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলো আর শব্দের মাঝে মহাপুরুষ অন্তর্ধান করলেন। আমি চমকে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেম, জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি; অবিন আমার মুখে কেবলই জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে; আমি যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছি। মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটা ভিজে পটি লাগানো।

এই সময় আমাদের এক উকিল সহযাত্রী অবিনকে প্রশ্ন করলেন, 'গাড়িটা যে মটোরের ধাক্কায় উল্টে গেল আপনি তার নম্বরটা নিলেন না কেন? এঁর মাথায় যে-রকম চোট লেগেছে তাতে নালিশ চলত।'

টুপি

আমাদের এ লাইনের ত্বখানা জাহাজের হঠাৎ সশরীরে বসোরা-লোক প্রাপ্ত হবার কারণ যে চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে কি মুখুয্যে মশায়দের পদধূলি নয়, সেটা নিশ্চয়। আজন্ম ত্রিসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরেণু মেখে, গঙ্গাজলে নিয়ত ডুবে থেকে ও গঙ্গার বাতাস সেবা করেও জাহাজ ত্বখানা, মায় তাদের পুরানো তক্তার ঘুণ ও বেঞ্চি-গুলোর ছারপোকা-স্থদ্ধ, গোলোকে না গিয়ে কেন যে বরাবর বসোরার গোলাপবাগে হাজির হয়, এর সঙ্গে অবিনের বুকের মাঝে বারোমেসে গোলাপফুলের খসে-পড়া পাপড়িগুলোর কোমল স্পর্শের কোনো যোগাযোগ আছে কি না, সেটা আবিষ্কার করতে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, সেই সময় একদিন বিকেল সাড়ে-পাঁচটার স্টীমারে পাশের বেঞ্চে একটু জায়গা কোনোরকমে দখল করে চলেছি একটু হাওয়া খেয়ে আসবার আশায়। কিন্তু, ত্বরদৃষ্ট— এক জাহাজ বটে, কিন্তু তাতে লোক উঠেছেন প্রায় তিন-জাহাজ! তার উপর খালাসি আছেন, সারেঙ আছেন, সাহেব আছেন, সাহেবের বেতে-ছাওয়া চৌকি আছেন, আর আছেন সমস্ত পুলিশ-কোর্টটি! ন স্থানং তিলধারণং! এর উপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো কোনো গৃহিণীর ফরমাশ-দেওয়া আপিসের-ফেরতা-মার্কেটের ফুলকপি, শনির তাগাদা-মতো সা ও লা কোম্পানির গ্রীন্ সিল্ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সব অনবরত এসে পড়তে বিলম্ব করছে না।

এই সময় অবিনকে আহিরিটোলার ঘাটে তার বাঁয়া-তবলা গোবিন্দ চাকর আর আলবোলা নিয়ে লাল-কাপড়ে-বাঁধা বিশ্ব-

সংগীতের মোটা পুঁথি বগলে জাহাজ ধরতে দেখে, মন আমার 'হা হতোস্মি' বলে মূর্ছিত হয়ে যে পড়ে এমন-একটু স্থানও পেলে না। দাবাবোড়ের আটঘাট-বাঁধা রাজার মতো বেচারা কিস্তিমাতের অপেক্ষা করেই রইল।

বোঝাই কিস্তি আমাদের ঘাট ছেড়ে গঙ্গার মাঝ দিয়ে উত্তরমুখে আস্তে-আস্তে চলেছে। আশপাশের মানুষের মাথাগুলো এত কাছে এবং এত বড়ো করে দেখতে পাচ্ছি যে দূরের জিনিস, তীরের ও নীরের, কিছু আজ আর চোখেই পড়ছে না। এই মাথামুণ্ডুর উপরে কেবল দেখছি প্রকাণ্ড খোট্টাই টুপির মতো আধখানা সূর্য— যেন লাল সাটিন কেটে দর্জি সেটা এইমাত্র বানিয়ে সব মাথাগুলোতে ফিট করে নিতে চাচ্ছে।

টুপির রহস্যে মনটা আমার যখন বেশ মগ্ন হয়েছে সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে অবিন আমায় ডাকলে, 'ওহে, এদিকে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে অবিনের হাত এসে ছোঁ মেরে আমাকে একেবারে ফার্স্ট্ ক্লাসের প্রথম বেঞ্চি থেকে লাস্ট্ ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে এনে উপস্থিত করলে।

চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা হোল্ড-অল থেকে চট্‌কানো কাপড়ের স্যুট্‌টার মতো মানুষের ঐ চাপন থেকে অবিন যখন আমাকে টেনে এনে বাইরে ফেললে তখন কী যে সোয়াস্তি পেলুম! আঃ! জাহাজের এই অংশটা ফার্স্ট্ ক্লাস থেকে বরাবর গড়িয়ে এসে, একেবারে গঙ্গার জল আর দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে ডুব দিয়েছে। এখানে ভদ্রয়ানার চাপ এক আনাও নেই; খোলা বুক, খালি পা নিয়ে এখানে কাজ থেকে খালাস-পাওয়া যত খালাসি সূর্যাস্তের আলোর মধ্যে নিজেদের মজলিস সারিগানের সুরে জমিয়ে তুলেছে।

সে একটি ছোকরা— হয়তো ঠিক ছোকরা বলতে যতটা বোঝায়

বয়সটা তার চেয়ে বেশি হলেও হতে পারে— কিন্তু মুখচোখ তার এখনো কাঁচা। জগতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ করে দিয়ে বিজ্ঞ হয়ে বসবার এখনো তার দেরি আছে, সেটা বুঝলুম, এবং তার মুখে এই গানটা আমার ভারি অদ্ভুত ঠেকল—

উত্তর থিকে অ্যালো বঁধু ভাঙা লায়ের গুন টানা,
আমার বঁধু দাঁড়িয়ে আছে পুন্নিমের ওই চাঁদখানা!
বঁধুমুখের মধুর হাঁসি গ্যাখলে নয়ানজলে ভাসি,
বঁধুর কথা রসে-ভরা ঠিক যেন চিনির পানা!

কলাই-করা ডেক্‌চির বাঁয়া-তবলার তালে-তালে মাথা দোলাতে-দোলাতে ওই বঁধু, চাঁদ, চিনির পানা, নয়ানজল এবং উত্তর থেকে গুন টেনে ভগ্নতরীর আসার মধ্যে সারবস্তু কিছু উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় অবিনের মাথার কালো টুপিটা উড়ে ডেকের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বেঞ্চির তলা হয়ে জাহাজ টপ্‌কে একেবারে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জোগাড় করলে। অবিন তাকে মাথায় চড়ালেও টুপিটা ছিল নিতান্ত আমারই, সুতরাং আমি যখন তাকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছি সেই সময় পিছনে হোঃ হোঃ হাসির রব শুনে ফিরে দেখলেম, সেই খালাসি ছোকরা তার দু পাটি দাঁত বের করে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে— আমারই দিকে চেয়ে। আমার তখন রাগ করবার মোটেই অবসর ছিল না। নগদ সাড়ে-সাত টাকা মূল্যের হোসেন বক্সের দোকানের নতুন টুপিটা জলে যাওয়া থেকে কোনোরকমে বাঁচিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অবিনের পাশে এসে বসেছি, সেই সময় সেই ছোকরা খালাসি আমাকে এসে সেলাম করে বললে—

'হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন। মাথা থেকে টুপি খসে পড়লে আমি বড়ো খুশি হই। ওটা জলে গেলে আমি আরো খুশি হতুম। টুপি নিয়ে আমি অনেক ভোগ ভুগেছি। ছেলেবেলায় আমার বাপ আমাকে কখনো টুপি পরতে দেন নি। তিনি বলতেন, লণ্ঠনের উপর গেলাপ ঢাকা দিলেও যা, মানুষের মাথায় টুপি চাপালেও তা— আলো পাওয়া শক্ত হয়। টোপকে মাছ যেমন এড়িয়ে চলে, ছেলেবেলা থেকে, কি দেশী কি বিদেশী, সব টোপিকে তেমনি ভয় করে কেবলমাত্র খোদার-দেওয়া টুপিটা নিয়ে আমি বড়ো হতে লাগলুম। সেই সময়ে আমার বাপ একদিন যে কালো টোপি মাথায় পৃথিবীতে এসেছিলেন তার কালো রঙ, ধোয়া কাপড়ের মতো, এই গঙ্গাজলের ফেনার মতো, পুন্নিমার ওই চাঁদের জোছনার মতো সাদা করে নিয়ে খোদাতালার দরবারে হাজরি দিতে চলে গেলেন।

'মা তো ছিলেন না, বাপও গেলেন, এক ছেলে আমাকে অগাধ বিষয়ের মালিক রেখে। কিন্তু, বেশিদিন আমাকে অনাথ থাকতে হল না। অনেক জুটল, এ গরিবের মা-বাপ হয়ে বসবার লোক অনেক জুটল। এত জুটল যে তাদের ভিড়ে আমার সদর ও অন্দর ভরতি হয়ে শেষে আমার মালখানা তোসাখানা আস্তাবল পর্যন্ত সর্‌গরম গুলজার হতেও বাকি রইল না। আমার মাথা খালি দেখে বাপও কোনোদিন সেটাকে টুপি ঢাকা দিতে ব্যস্ত হন নি, এবং মাও কখনো দুঃখ পান নি। কিন্তু, এরা আমার মাথায় টুপি না দেখে একেবারে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমার খালি মাথার পর্দা রাখবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল এবং মৌলবি সাহেবরা যতদিন না বিচ্‌মিল্লা বলে জাঁকালো একটা খুব উঁচু টুপি আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন ততদিন এরা কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না। টুপিটা বাইরে খুব জম্‌কালো, জরি জরাবতের কাজ, আর ভিতরটায় গাধার চামড়ার

গদি লাগানো। তারা এমন চমৎকার করে সে টুপিটা বানিয়েছিল যে, টুপি পরা কোনোদিন অভ্যাস না থাকলেও সেটা পরতে আমার কোনো কষ্টই হল না।

'নতুন গোঁফ উঠতে আরম্ভ হলে যেমন সময়ে-অসময়ে সেটাতে তা না দিয়ে থাকা যায় না, তেমনি এই টুপিটাকে যখন-তখন মাথায় দিয়ে আমি বেড়াই। টুপির গুণে আমার মুখ দেখতে দেখতে বুড়োদের মতো গম্ভীর, আমার কথাবার্তা চালচলন খুব পাকা আর মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আমার খুবই চক্‌চকে ও চওড়া হয়ে উঠল। ওই টুপিটা দেখলেই রাস্তার লোকেরা আমাকে খুব বুদ্ধিমন্ত শ্রীমন্ত এবং আরো কত কী বলে দু হাতে সেলাম ঠুকতে লাগল, আর তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে দুবেলা মহল-ভরা আমার মা-বাপেদের পায়ে তেল দেবার জন্যে হাজির হতে লাগল।

'এতগুলো মাথা একত্র হয়ে আমার বিয়েটা কী রকম সর্বগ্রাসী ধুমধামের সঙ্গে যে দিয়েছিল তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন। এতগুলো শ্বশুর-শাশুড়ির মন জুগিয়ে চলতে আমার স্ত্রীর সে কী যমযন্ত্রণা! বিয়ের হিসেবের খাতা চুকতে না চুকতে বেচারা প্রাণত্যাগ করলে। আর, সাতরাজার ধনে ধনী আমাকে মাথার টুপি ভিক্ষের ঝুলির মতো করে বোগ্‌দাদের রাস্তায় রাস্তায়, মাদ্রাসা থেকে মাদ্রাসায়, উমেদারি করে ফিরতে হল। টুপিকে আমার কেউ অনাদর করলে না বটে, কিন্তু টুপি যার মাথায় বাসা বেঁধেছিল সেই টাকার মতো একটি গোল টাক-ওয়ালা মানুষটিকে দেখলেম কেউ খাতিরেও আনতে চাইলে না সেই দুঃখের দিনে।

'কতকাল টুপি-পরার এই ফল— অনেক তদবিরের এই টাক— একে আবার সেই টুপিতে ঢেকে বোগ্‌দাদ ছেড়ে আমি বসোরার

দিকে রওনা হলেম। যদি কেউ না জোটে তবে টুপির একটা দোকান খুলে দেশসুদ্ধকে টুপি পরিয়ে তবে ছাড়ব! অবিশ্যি, এ বুদ্ধিটা বোগ্‌দাদে থাকতে থাকতে আমার মাথায় জোগালে হত ভালো। কিন্তু কে জানে, ওই টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বাকান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারই গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগ্‌দাদ থেকে অনেক দূরে বসোরায় এসে পেঁাচেছি। এখানে কেউ টুপি মাথায় দেয় না! গোলাপ-ফুলের পাপড়ির গোড়ে-মালা গেঁথে তারা পাগড়ির মতো কিম্বা আপনাদের ওই শিবঠাকুরের সাপের মতো কেবল মাথায় জড়িয়ে রাখে। বোগ্‌দাদে আমার মতো সুপুরুষ কমই ছিল; এখানে দেখলেম আমার মতো সুপুরুষকে কেউ বিয়েই করতে রাজি হয় না। তার উপর মাথার মাঝে ছিল সেই টাকা-প্রমাণ টাকটি! সেখানে কেউ টুপি পরে না, সেখানে সর্বদা টুপি দিয়ে টাক ঢেকে যে কী আতঙ্কে আর অসোয়াস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেম তা কেমন করে জানাব। আমার কেবলই মনে হত, বসোরার এই গোলাপফুলের খোস্‌বোতে ভরা জোর বাতাসে যেদিন আমার এ টুপিটা উড়ে যাবে, সেদিন গাধার রোঁয়ার আস্তরের আওতায় টাক-পড়া মাথাটা আমি কোন্‌খানে গিয়ে লুকোব। বসোরায় যেমন গোলাপফুল তেমনি গোলাপি ঠোঁটের মধুর হাসিও অনেক— সেই হাসির তুফানের ঝাপ্‌টা থেকে টাক বাঁচাতে আমাকে কী ভোগই না ভুগতে হচ্ছিল। টুপিটা আমার মাথার কুরুনি পোকার মতো; তাকে টেনে ফেলতে পারা শক্ত, তাকে রাখলেও যন্ত্রণার অন্ত নেই।

‘এই সময় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা— আমি প্রেমে পড়লেম! আসকের আগুন যদি মগজেই জ্বলত তবে সেটাকে টুপি চাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম। কিন্তু, সে যে খোদার নিজের হাতে

জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেন নি। ত্বনিয়াকে রোশনাই দিতে সে-বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন বুকের মাঝখানে প্রাণের সঙ্গে এক-শামাদানে।✓ সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলেম তাকে কী সুন্দরই না দেখলেম! যদিও সে বসোরার গোলাপবাগের খুব ছোটো ফুল বই বড়ো ফুল ছিল না। সেইদিন আমি সর্বপ্রথম খোদাতালার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইলুম— আমার ছেলেবেলাকার সেই কোঁকড়া-চুল খালি মাথা! হাসবেন না, বাবু। সবাই চায় খোদার কাছে বড়ো হতে; আমি বললেম, 'আমায় ছোটো করো'। ত্বনিয়া ছিষ্টি হয়ে এমন ভিক্ষে শুধু কি আমিই চেয়েছি? কত লোক চেয়েছে, পেয়েছে, এখনো চাচ্ছে, দেখুন-না—'

আমি সেই ছোকরার কথায় নদীর পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলেম, পৃথিবীর মাথার উপর থেকে সেই লাল মখ্‌মলের বড়ো টুপিটা সরে গেছে, দিগন্তের শিয়রে কালো মেঘ এসে লেগেছে, আর নদীর পুবপারে চাঁদনী রাতের নতুন জ্যোৎস্না— তারই তলায় গাছের আড়ালে একটি মন্দিরের ঘাটে বাঁশিতে সাহানার সুর বাজছে।

সেই নতুন রাতের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে জাহাজ এসে বড়োবাজারের ঘাটে লাগল। আমি অভ্যেস-মতো অবিনের কাছ থেকে আমার টুপিটা চাইতেই সে অবাক হয়ে বললে, 'সে কী! তোমার পাশেই তো সেটা ছিল!'

জাহাজ থেকে অনেকগুলো টুপিওয়ালা নেমে গেল, কেবল আমরা ত্বই বন্ধুতে নামলেম খালিমাথা। তার পরদিন সে-জাহাজখানাও বসোরায় চলে গেল। গল্পের শেষটা শোনবার ইচ্ছা থাকলেও, সে-ছোকরার আর দেখা পেলুম না।

শালখানা দেখতে সচরাচর যেমন হয়, একখানা জরদ কালো সবুজ আর লাল রঙের চারবাগ। কিন্তু সেখানি প'রে ষ্টীমারের ফার্স্ট্‌-ক্লাসের বেঞ্চিতে এসে যে বসল তার চেহারাটা মোটেই সেই কাশ্মীরী শালের উপযুক্ত ছিল না— খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা কিট্‌কিটে ময়লা পাগড়িতে ঢাকা, গালের হাড়ছটো উঁচু, আর তারই কোটরে শুকনো আঙুরের-রঙ দুটো বিশ্রী চোখ। অবিনের দস্তুর, নতুন লোক দেখলে সে তার দিকে খানিক কট্‌মট্‌ করে না তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেদিনও বেঞ্চিখানার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট-পাঁচেক সেই লোকটাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তবে অবিন আস্তে আস্তে আমার পাশে এসে বসল। তার পর এ-ঘাটে ও-ঘাটে সে-ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে, জাহাজ লোকে লোকে ভর্তি হতে হতে, যখন আমাদের ঘাটে এসে পৌঁছল, সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ভদ্রলোক অবিনকে বলে উঠলেন, 'আপনার শালখানা এখনি হাওয়ায় উড়ে গঙ্গায় পড়বে, ওখানাকে একটু সাবধানে রাখুন।'

আমরা দুজনে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, সেই চার-রঙা চারবাগ শালের রুমালটা জাহাজের রেলিঙ থেকে ঝুলছে, সে মানুষ নেই!

শালখানা যার, সে নিশ্চয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে নি। সুতরাং আমরা দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে হাত-ধরাধরি করে আহিরিটোলার ঘাটে নেমে গাড়িতে উঠেছি এমন সময় এক ছোকরা খালাসি 'বাবু, শাল আপনার' বলেই তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা

গলিয়ে সেই শালখানা অবিনের কোলের উপর ফেলে দিয়ে চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। আমি গাড়ি থামিয়ে সেই খালাসিকে ডাকতে যাই, অবিন বললে, 'থাক-না, কাল ফিরিয়ে দিলেই চলবে।'

বন্ধুবান্ধবের টুপি ইত্যাদির মতো টুকিটাকি জিনিস হলে আমার আপত্তি ছিল না; কেননা সেগুলো অবিন প্রায় ধার নেয় এবং আজ বাদে কাল, নয় তো পরশু, সুদসুদ্ধ সেগুলো ফিরিয়ে দিতে কিছুমাত্র দেরি করে না। কিন্তু, এই শালখানা যার সে যে অবিনকে সেখানা বখশিস কিম্বা একরাত্রের মতো ভাড়া দেবার মতলবে স্টীমার পর্যন্ত তাড়া করে আসে নি, সেটা ঠিক, এবং সে যে পুলিশে খবর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে সেটাও সম্ভব নয়। কাজেই পোর্ট-কমিশনারের হারানো-মালের আপিস-ঘরের দিকেই গাড়িটা চালাতে আমি অবিনকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেম। কিন্তু সব বৃথা! বাঘের থাবা শিকারের উপরে যেমন, তেমনি অবিনের মুঠো সেই শালখানার একটা কোণ সেই-যে চেপে রইল, আহিরিটোলার বাড়িতে পৌঁছানো পর্যন্ত সে-মুঠো আর কিছুতে শিথিল হল না।

তার পর ঘরে ঢুকে অবিন যখন সেই শালখানা মেঝের উপরে বিছিয়ে দিলে তখন দেখলেম, কী আশ্চর্য সোনা-রুপো-রেশমের তার দিয়েই সেটা বোনা। স্টীমারে শালখানার সবটা আমার চোখে পড়ে নি। এখন বাতির আলোতে যেন একখানা নন্দনকানন আমাদের চোখের সম্মুখে এসে উদয় হল। এরই উল্টো পিঠে দেখলেম বোনা রয়েছে—বীণা-হাতে এক কালো কুৎসিত ঝাঁকড়াচুল ডাইনি-বুড়ি। পরের জিনিসকে ঠিক লোষ্ট্র ভেবে নিয়ে সেটার উপরে সম্পূর্ণ নির্লোভ হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব কি না সেটা পরখ করবার কারণ কোনোদিন আমার কাছে উপস্থিত হয় নি,

কিন্তু কারিগরের হাতের অপূর্ব সৃষ্টিগুলোর উপরে আমার যে-প্রাণের টান সেটা যে অবিনের হাত থেকে এই অমূল্য শালখানা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে না-চাচ্ছিল তা নয়।

কিন্তু, অবিনকে আমি চিনতেম। কাজেই শালখানা তাকে খুব সাবধানে রাখতে আর পুলিশ-হাঙ্গামার পূর্বেই যদি সম্ভব হয় সেটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে বিশেষ করে বলে আমি বাড়ি এলেম। তার পর দুদিন আমি জাহাজে যাওয়া কামাই দিলেম। না-যাওয়ার কারণ নানা। তার মধ্যে প্রধান কারণ লালপাগড়ি আর স্টীমারের উপরে সেই শাল-হাতে অবিনের একটা অবর্ণনীয় রূপ কল্পনা।

.

তৃতীয় দিনের সকালে সাতটা-দশের স্টীমার আমাকে একলা নিয়ে বড়োবাজার ছেড়ে আহিরিটোলার দিকে চলেছে। সকালের রোদে ভাটার জল আর জলের ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ভিজে কাদা মাজা কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। তারই উপরে অনেকগুলো মানুষ কালো-কালো আবলুস কাঠের পুতুলের মতো দেখছি। ঘাটের ধারে পাঁচিলে-ঘেরা শ্মশানের মধ্যে থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। এরই উপরে দেখতে পাচ্ছি, লাল-সাদা-ডোরা-টানা তেতালা একটা বাড়ির চিলের ছাদে মাটির এক মহাদেব পিতলের ত্রিশূল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, আর ঠিক তারই পিছনে আলোর গায়ে একটি মস্‌জিদের তিনটে গম্বুজ—অপরাজিতা ফুলের মতো নীলবর্ণ।

আহিরিটোলার ঘাটের যে-কোণটিতে রোজ অবিন দাঁড়িয়ে থাকে সেই কোণটায়, দূর থেকে তার বিশাল বুকের মাঝে চির-বসন্তের সিগ্‌নেলের আলোর মতো বড়ো লাল-গোলাপফুলটার সন্ধানে

আমার চোখ আজ দৌড়ে গিয়ে দেখছে, অবিনের জায়গায় একটা রবাব-কাঁধে একজন পেশোয়ারী— কালো লুঙ্গি, ঢিলে কোর্তা, বড়ো পাগড়ি, কটা দাড়ি, কোঁক্‌ড়ানো চুল নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বয়া প্রদক্ষিণ করে স্টীমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে ঘুরে তবে আজ আহিরিটোলার ঘাটে ভিড়ল। অবিনকে না দেখে, সেদিনের সেই শালখানাই যে তার এদিনের ছুটি এবং কামাই দুয়েরই কারণ, এবং পুলিশ-কোর্টেই যে তাকে আটটার মধ্যে খেয়ে হাজরি দিতে হচ্ছে, এটা আমি একরকম স্থির করেই নিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে একলা কবীরের পুঁথির সঙ্গে দু ঘণ্টা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসলেম। ঘাট ছেড়ে জাহাজ আর-একবার একটা গাধাবোটের রগ ঘেঁষে পাট-বোঝাই একখানা কিস্তিকে সজোরে ধাক্কা মেরে বাগবাজারের লোহার পোল ডাইনে রেখে সোজা কাশীপুরের দিকে চলল।

খড়-বোঝাই হোলাগুলো আদিম যুগের লোমশ কতকগুলো উভচর জন্তুর মতো ডাঙার খুব কাছাকাছি কাদাজলে নিজেদের অনেকখানি ডুবিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাঙার উপরে মালগাড়ির সার যেন আর-একটা শক্ত খোলায় মোড়া বিকটাকার গুটিপোকার মতো আস্তে আস্তে চলেছে। দূর থেকে কাশিপুরের জেটিটা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে অবিন দাঁড়িয়ে— জলের নীলের উপরে, সোজা বিশাল স্থির, নিবাতনিষ্কম্পমিব। তার কাঁধ থেকে সেই শালখানা নানারঙের ফুলের একটা মস্ত গোছার মতো ঝুলে পড়েছে সুন্দর ভঙ্গীতে। আমি গুন্‌গুন্‌ করে শুরু করেছি—

'হুয়া জব ইষ্ক মস্তানা
কহেঁ সব লোগ দিওয়ানা।'

রবাবটায় একটা মস্ত ঝংকার দিয়ে পিছন থেকে সেই পেশোয়ারীটা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসল—

'জিসে লাগি সোঈ জানা
কহেসে দর্দক্যা মানা।'

পণ্টুন থেকে অবিন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আগাসাহেব, কাবুলি গীত ফরমাইয়ে, নেহি তো দোশালা ছোড়েগা নেহি।'

এর পরেই জাহাজ ঘাটে ভিড়তেই অবিন ঝুপ করে সেই শালখানা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে স্টীমারে উঠে এল। আগাসাহেব তাকে একটা মস্ত সেলামবাজি করে রবাবের সঙ্গে একটা কাবুলি গান আরম্ভ করলে—

'স্লমিওসী পমঙ্গল স্লমিওসী
পদম্‌কেনা পমঙ্গল স্লমিওসী-ঈ-ঈ—'

সুরও যেমন, কথাও তেমনি বিদ্‌ঘুটে! 'পমঙ্গল' 'পমঙ্গল' যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলই ভন্‌ভন্‌ করছে আর মাঝে মাঝে 'স্লমিওসী' সেগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য এই যে, অবিন বেশ মশগুল হয়ে এই ভন্‌ভনানির মাঝে সুখে বসে রয়েছে। কানে কম্ফর্‌টার এবং তার উপর সাতপুরু চাদর জড়িয়ে একটি রোগা ছেলে— এই কম্ফর্‌টার ছাড়াবার জন্যে আমি তাকে রোজ ধমকাতে ছাড়ি নে, কিন্তু আজ তাকে দিব্য হাস্যমুখে সাম্‌নের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আমার কী হিংসেই না হচ্ছিল! শ্রবণের দরজায় আগল টেনে ছোকরা আজ কী সুখেই আছে সুর-বেসুর সবার থেকে দূরে! নিবিড় নীরবতার অন্দরে আপনাকে ডুবিয়ে রাখবার আমার প্রার্থনাটা বোধ হয় বিনা-তারের টেলিগ্রাফের মতো মা-গঙ্গার কাছে পৌঁছে থাকবে, তাই রবাবের সুরটা বালির ঘাটে পৌঁছবার কিছু আগেই একটা তার-কাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে

বন্ধ হল কাবুলি গানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত করে। অমনি হুস্ করে একটা হাওয়ায় চারি দিক থেকে শোনা গেল, 'বস্!'

অবিন একটা মিলিটারি-রকম সেলাম দিয়ে আগাসাহেবকে বললে, 'তাগা তো টুটা। অব্?'

'অব্ শুনিয়ে' বলেই আগাসাহেব আরম্ভ করলেন পোস্ত উর্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প— সেই শালখানার আদ্যন্ত কাহিনী। গল্পটা খুব গুরুপাক করেই আগাসাহেব আমাদের উপহার দিলেন, ভাষায় পেঁয়াজ রসুন আর হিঙ তিনেরই বুকনি দিয়ে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অবিন গল্পটার খুব তারিফ করলেও আমি সেটা থেকে বড়ো-কিছু রস গ্রহণ করতে পারলেম না। মাথা তখনো আমার কাবুলির সেই বেসুরো গান আর রবাবের ঝন্ঝনানিতে বিগড়ে ছিল; সুতরাং গল্পের সঙ্গে গল্প-কর্তাকেও জাহান্নামে পাঠাতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করলেম না, কিন্তু মনে মনে। কারণ কাবুলি-মাত্রেরই যেটা চিরসহচর, মোটা সেই লাঠি, তার সামনে মুখ ফুটে কিছু বলা একেবারেই আমার মতবিরুদ্ধ।

সকালের গঙ্গার পরিষ্কার পটখানির উপর হিজিবিজির মতো এই লোকটার গল্প আর গান! সেটা শেষ করে সে যখন কটা দাড়ির আড়াল থেকে বত্রিশটি দাঁত বের করে বললে 'বাবু, শাল দেও, অব্ হাম চলে', তখন অবিন খুশির সঙ্গে তাকে সত্যিই সে শালখানা দিয়ে দেয় দেখে আমি আর রাগ সামলাতে পারলেম না। ঝাঁ করে অবিনের হাত থেকে শালখানা টেনে নিয়ে বললেম, 'তুমি কেমন হে! কার শাল তুমি কাকে দাও? কোথাকার একটা জোচ্চোর মিথ্যে বকর-বকর করে ফাঁকি দিয়ে এই দামি শালটা নিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না।'

অবিন আমার ব্যবহার দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। কাবুলিটা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, 'ক্যা বাবু, হাম জুয়াচোর হ্যায় ?'

আমার রাগ তখন সপ্তমে, সুতরাং গলাটাও সেই সুরে বললে, 'যেন কাবুলের আমীর রে! যাঃ যাঃ! আর শাল পরতে হবে না! এটা আমার শাল হ্যায়! জানতা এখনি তোম্‌কো পুলিশকা হাতে জিম্মে করে দেগা!'

রাগের মাথায় বিত্তাসাগরী বাংলা একেবারে হারিয়ে ফেলে গড়্‌গড়্‌ করে চলতি বাংলাতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই বলে গেলেম। কে জানে, চলতি ভাষার অ্যাক্‌সেণ্টের জোরেই হোক বা বালির ঘাটে লালপাগড়ির জীবন্ত অ্যাক্‌সেণ্ট্‌টাকে দেখেই হোক, কাবুলিটা তার গেলাপ-মোড়া রবাবটাকে কাঁধে তুলে চোঁ চোঁ চম্পট দিলে— সোজা পন্‌টুন বেয়ে লেলুয়ার মুখে। আমি তখন খুব গম্ভীর হয়ে শালটা নিজের কাঁধে ফেলে আপনার জায়গায় স্থির হয়ে বসলেম। গঙ্গার বাতাসে রাগ ঠাণ্ডা হতে আমার বেশীক্ষণ লাগল না।

অবিন দেখলেম, ছুই চোখ নিমীলিত করে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। গাল খেয়ে কাবুলিটা আমায় যদি খুনও করে যেত তবু তার চোখ খুলত কি না সন্দেহ। এমনি খুব চেপে ছুই চোখ বন্ধ করে সে পৃথিবীর গণ্ডগোল থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে চলেছে সেটা আমি বেশ জানি এবং সে এই চোখ যখন খুলবে তখন যে ধমকের অগ্নিবাণটা আমার উপরেই প্রথম পড়বে তাও আমি জানতেম। আমি আর তিলার্ধ বিলম্ব না করে শালখানি আস্তে আস্তে তার পাশে রেখে পাশ কাটিয়ে একটু দূরে বসলেম; যেন প্রথম চোখ খুলেই শালখানাকে অবিন দেখতে পায়— পোড়ে তা শালখানাই পুড়ুক, আমি কেন মরি! যা ভেবেছিলাম তাই। শালখানা চোখে পড়তেই অবিন সেটাকে সজোরে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বসন্তের ফুলে-

ফুলে-বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব শালটি উড়তে-উড়তে গিয়ে জলে পড়ল দিগ্‌বিদিক যেন আলো করে।

আমি বললেম, 'ওহে করলে কী?'

'পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করলেম, যার জিনিস তাকে জোচ্চর বলে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে নিজের পকেটে সেটা না পুরে।'

বলেই অবিন আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণে বুঝলেম, শালখানা কাবুলিকে নিয়ে যেতে বাধা না দিলে জুয়াচুরির কলঙ্কটা কাবুলি পর্যন্তই থাকত, আমার গায়ে গড়িয়ে লাগত না। অবিন পুলিশ কাবুলি এবং বাটপাড়ির কলঙ্ক তিনটে থেকে বেঁচে গেল; ধরা পড়লুম আমি, জয়মিত্রের ঘাটটার ঠিক আড়পারে!

তার পর থেকে বসন্তের হাওয়ায় আমি রবাবের ছেঁড়া তারের টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি, আর সেই শালের উল্টো-পিঠে-লেখা ডাইনি-বুড়ির কাঁচা-পাকা চুলের ঢেউটাই গঙ্গার নির্মল স্রোতকে ঘোলা করে দিয়েছে দেখছি। পাকা ধানের সোনায়, কচি ঘাসের সবুজে, দিনের উদয়-অস্তের রক্তে, রাত্রির ঘুমের অন্ধকারে ছোপানো চার-বাগ শালখানা ফুলের ভেলাখানির মতো ভাসতে ভাসতে আর-কোনোদিন যদি নতুন ক'রে আমার চোখে পড়ে তবে আবার তার কথাটা তুলব। না হলে এই পর্যন্ত।

মাতু

আজকের সকালটা একেবারে কুয়াশায় ঢাকা। এমন কুয়াশা এ শীতে একদিনও হয় নি। জল স্থল আকাশ দুধে-গোলা আলোর মধ্যে ডুবে রয়েছে ; যেদিকে দেখি মনে হচ্ছে, যেন নাকের সামনে প্রকাণ্ড একখানা ঘসা কাঁচ ঝুলছে। জাহাজের সব বেঞ্চিগুলো শিশিরে ভিজে উঠেছে ; কোথাও একটু বসবার স্থান নেই। সাতটা-পঞ্চাশে জাহাজ ছাড়বার কথা, আটটা-পঁচিশ হয়ে গেল তবু আজ সহযাত্রী কারো দেখা নেই। জাহাজের সারেঙ কান-ঢাকা টুপি, পশমের পাঁচরঙা গলাবন্ধ আর লক্ষ্মৌছিটের ময়লা একখানা বালা-পোশ জড়িয়ে একটা মেছুনির ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে ভালো মাছগুলি লাল রঙের একটা বালতিতে নিজের জন্যে তুলছে। জাহাজ আজ ঘুমন্ত হাঁস ; যেন ডানার ভিতর মুখ গুঁজে জলের ধারটিতে স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওভারকোটের কলার্‌টা দুই কানের উপরে বেশ করে টেনে দিয়ে বসে রয়েছি। বাদলার দিনে স্কুলের খালি বেঞ্চখানায় বসে যেমন, ঠিক তেমনি আজ মনে হচ্ছে, গাড়ি পাই তো বাড়ি পালাই। এমন সময় সামনে কুয়াশার ভিতর থেকে শুনলুম কচি গলায় কে ডাকলে, 'মা !'

বড়োবাজারের এই ঘাটটা— যেখানে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যাস্তের অনেক পরেও কর্মকোলাহলের বিরাম নেই, সেখানে আজ সব জাহাজগুলো ভেঁপু থামিয়ে কুয়াশার ভিতরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কি-রকম নিঝুম তা বুঝতেই পারছ। এরই মধ্যে কচি গলার সেই 'মা' শব্দ, সে যে আমার অন্তরের অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছল তা কি আর বলতে হবে। আমি যেন ঘুম থেকে

চম্‌কে উঠে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম— ঠিক আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের ডেকের দিকে মুখ করে দুখানা বড়ো বড়ো দোতলা জাহাজ দুটো প্রকাণ্ড গোল-বারান্দা নিয়ে কুয়াশা ঠেলে আধখানা বার হয়েছে। একটা বারান্দার নীচে বড়ো বড়ো ইংরিজি কালো অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মাতু', আর-একটায় 'কুয়িস্তান'। শেষের জাহাজ-খানায় লোক দেখলেম না ; কিন্তু 'মাতু' বলে যে জাহাজ তার ওই বারান্দার নীচে যেখানে জাহাজের রান্নাঘর সেখানে দেখছি, ঝক্‌ঝকে কতকগুলো তামার ডেকচির কাছে বসে নীল-পাজামা-পরা একটা ছোকরা খালাসি রঙকরা একটা পাখির খাঁচা বেশ করে জল দিয়ে ধুচ্ছে। ঠাণ্ডা জলের ছিটে যতবার পড়ছে ততবারই খাঁচার পাখি সে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে উঠছে, আর সেই ছোকরা খালাসি তাকে কথ্য এবং অকথ্য ভাষায় গাল পেড়ে চলেছে।

পাখি পোষবার শখ আমার চিরদিনই আছে, তার উপর পড়া-পাখি। আমি একেবারে আমাদের ডেকের নাকের ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের আর পাখির রঙ্গটা দেখে নিচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে অবিন আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বললে, 'পাখিটা ভালো করে দেখবে তো আমার সঙ্গে এসো।'

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে অবিন আমাকে আবার বললে, 'এই ঠাণ্ডায় কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ ? আমাদের এ জাহাজ সাড়ে-ন'টার আগে ঘাট ছেড়ে নড়ছে না। চলো, ওই জাহাজখানার বুড়ো মালেকের সঙ্গে বেশ আলাপ আছে, সেখানে বসে বেশ আরামে তামাক খাওয়া যাবে আর গল্পগুজবও হবে। মীরসাহেব লোক বেশ। আলাপ করে খুশি হবে। আর ওই 'মাতু' জাহাজখানার মতো অমন জাঁকালো জাহাজ আর নেই, আগাগোড়া গিল্‌টি আর আয়না দিয়ে মোড়া। ওর ক্যাবিনগুলো দেখবার জিনিস।'

আমি অবিনের সঙ্গে আর-একটা প্রকাণ্ড জেটি আর পাটের গোডাউন পেরিয়ে মাতু জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজ তো নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি জলে ভাসছে! এক-একটা ডেক যেন এক-একটা কন্‌গ্রেসের প্যাণ্ডাল, এদিক থেকে ওদিকে নজর চলে না। পিতলের চাদর আর রবার-সিট দিয়ে মোড়া দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে, আমরা দৈত্যপুরীর সাতমহলের মতো সোনা আর স্ফটিকে মোড়া সেই জাহাজের ক্যাবিনগুলো একে-একে দেখে বেড়াচ্ছি, এমন সময় এক খালাসি এসে বললে, 'মীর-সাহেব আপনাদের ছেলাম দিয়েছেন।'

আমি অবিনের সঙ্গে মীরসাহেবের খাস-কামরায় গিয়ে দেখলেম, এক বুড়ো নাখোদা নেওয়ারের এক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছেন; পাশে এক-ডাবা পানের খিলি। তাঁর পিছনে খোলা জানলার কাচের ভিতর দিয়ে পাটের গোডাউনের টিনের ছাদের একটা আবছায়া দেখা যাচ্ছে। দস্তুরমতো আদর-আপ্যায়নের পর মীরসাহেব অবিনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এবার অনেক দিন পরে এ অঞ্চলে এলেম। সেই দুবছর পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা, আর আজ এই!'

অবিন আমাকে দেখিয়ে বললে, 'এই বন্ধুটিকে আপনার কাছে নিয়ে এলেম। এঁর বড়ো পাখির শখ; এঁর জন্যে সিঙাপুর থেকে এবার একটা কাকাতুয়া এনে দিতে হবে। যা হোক, এবার আপনার সফরের গল্পটা বলুন।'

বলেই অবিন খপ্ করে মীরসাহেবের বিনা অনুমতিতে ডাবা থেকে এক-থাবা পান তুলে নিয়ে দুটো নিজের গালে আর গোটা-চারেক আমার হাতে গুঁজে দিয়ে চোখ বুজে সোজা হয়ে বেশ জমিয়ে বসল। আমি পান-ক'টা হাতে নিয়ে ইতস্তত

করছি দেখে মীরসাহেব বললেন, 'পান খান্, না হলে গল্প জমবে না।'

বলেই মীরসাহেব শুরু করলেন—

'এদিকে সিঙাপুর-হংকং, ওদিকে সেকেন্দ্রা আর কুস্‌তুন্‌তুনিয়া এইটুকুর মধ্যে কত ঘাটেই না আমার জাহাজ ভিড়ল! দিনে-রাতে সুদিনে-দুর্দিনে আলোতে-অন্ধকারে এই পঁচাশি বৎসর কত নদীতেই না পাড়ি দিলুম, কত দরিয়াই না পার হলুম! কিন্তু, এই ভাগীরথী, এ আমার মনকে কেমন যে টানে তা আমি বোঝাতে পারব না। এই গঙ্গাতীরেই আমার জন্ম, আর এই বাংলার মাটিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমার কবর এই মাটিতে কি দরিয়ার অগাধ জলের নীচে খোদাতালা ঠিক করেছেন, তা তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু, আমার মন চায় যে, এই নদীর ধারে যেন আমার শেষ যাত্রার জাহাজখানা এসে ভেড়ে। কাল-বোশেখির ঝড়ের আগে আগে তুফান ঠেলে যখনি যেখানে আমি জাহাজ চালিয়েছি তখনি এই নদীতীরের ছবি, একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সবুজ শেওলায় ছাওয়া আমার নিজের কবরের ছবিটি, আমার মনে জেগেছে। ঘরের ছবিটি আমার বাংলাদেশের সঙ্গে গাঁথা নেই। এখানেই আমাদের ঘরবাড়ি ছিল কিন্তু সে কেমন ছিল, নদীর এপারে ছিল কি ওপারে, তা আমার কিছু মনে পড়ে না। ঘরে আমার কেই বা ছিল— ভাইবোন কাউকে মনে নেই। কেবল মনে আছে মাকে। অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর রূপ, আর কিছু না। এইটুকু আমার খুব ছেলেবেলার স্মৃতি, বোধ হয় যখন মায়ের কোলে মানুষ হচ্ছিলেম তখনকার।

'এর পর থেকে ঘটনাগুলো অনেকটা স্পষ্ট করে আমি দেখতে

পাই। তখন আমার বয়স কত বলতে পারি নে, গঙ্গার উপরে কতকগুলো কালো-কালো ডিঙি ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তীরের উপরে বসে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করে কাঁদছি। পরনে আমার একটুক্‌রো কাপড় নেই; মুঠোর মধ্যে আমার দুটো টাকা। টাকা-দুটো রেলের টিকিট কেনবার জন্যে— এটুকু আমার বেশ মনে আছে। তার পর এক সন্ন্যাসী— তার মাথায় জটা, গায়ে ছাই, কটা-কটা দাড়িগোঁপ— সে আমাকে এসে বললে, 'বেটা রোতা কাহে?' আমি তাকে কেঁদে বললেম, আমাকে মায়ের কাছে দিয়ে এসো, আমি দিল্লি যাব।' সন্ন্যাসী একটু হেসে আমার কাছে টাকা আছে কি না শুধোলেন। আমি তাঁর হাতে আমার টাকা-দুটো দিয়ে দিলেম, আর তাঁর হাত-ধরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকলেম। তার পর কী হল মনে পড়ে না। আমার জীবনের ঘটনাগুলোর মধ্যে আর-কোথাও ফাঁক নেই— এইটুকু ছাড়া।

'এর পরে একদিন নতুন কাপড় প'রে, দিল্লি যাব ব'লে লোটা-কম্বল পোঁটলাপুটলি বেঁধে, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা টিনের ছাদের নিচে কাঠগড়া-দেওয়া একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার চারি দিকে স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুড়ো, আরো কত লোক; কেউ বসে, কেউ আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরখানার দুটো লোহার থামের মাঝ দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে। এমন সময় ঠিক এমনি একখানা বড়ো জাহাজ এসে সেই ঘরখানার গায়েই লাগল। সেটা এত বড়ো যে, মনে হল না যে জলে আছে। একটা সাহেব এসে আমাদের সবার হাত-পা বুক-পিঠ টিপে টুপে দেখে বড়ো একখানা কাগজে কি লিখে দিয়ে গেল, আর অমনি কাঠগড়ার দরজা দিয়ে হুড়হুড় করে লোক

গোরুর পালের মতো জাহাজে গিয়ে উঠল। সন্ন্যাসী আমার পিঠ-চাপড়ে বললে, 'যা, বেটা, দিল্লি!' বলেই আমার হাত ধরে জাহাজে উঠিয়ে দিলে। আমি জাহাজে উঠেই ফিরে দেখ্‌লেম সন্ন্যাসী ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেছে। দিল্লি যাবার উৎসাহে আমার মন এতক্ষণ আনন্দে ছলছিল, সন্ন্যাসীকে লুকোতে দেখে হঠাৎ যেন আমার ভিতরটা একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কতক্ষণ এমন ছিলেম বলতে পারি নে, হঠাৎ একসময় জলে হুস্‌হুস্‌ শব্দ শুনে চম্‌কে দেখি জাহাজ চলছে; আলো-অন্ধকারে জলের উপরটা যেন বোরা সাপের পিঠের মতো দেখাচ্ছে। একটা সাদা টুপি ও খয়েরি কোট-পরা কালো সাহেব এসে আমাকে জাহাজের এক দিকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেখানে একদল মেয়েমানুষ আমাকে দেখে হঠাৎ চীৎকার করে বুক চাপড়ে, কেউ বেটার নাম ক'রে, কেউ 'বাপ' ব'লে, কেউ 'ভাই রে' ব'লে কাঁদতে লাগল। সাহেব তাদের এক ধমক দিয়ে চলে গেল। সেই সব সহযাত্রীর কথায়-বার্তায় জান্‌লেম, এখানা কুলির জাহাজ। কিন্তু তখন আমি এত ছোটো যে কুলি কাকে বলে বুঝতেম না। সেই নদীর জল, আকাশের আলো, দূরে দূরে তীরের বন, বালির চড়ার উপরে সূর্যের উদয়-অস্ত দেখতে দেখতে ক'দিন আমার আনন্দে কেটে গেল।

'তার পর চা-বাগানের ইতিহাস। সেখানে মানুষের মেরুদণ্ড মানুষ হয়েও কেমন করে যে তিলে তিলে মুচড়ে মুচড়ে ভাঙে তা দেখেছি; মানুষের উত্তপ্ত রক্ত চাবুকের চোটে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে কী ক'রে যে মানুষ ভারবাহী জীবের মতো মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে পরের বোঝা টানতে টানতে শেষে একদিন তপ্ত বালির উপরে মুখ গুঁজড়ে, বুক ফেটে মরে— তাও দেখেছি; কিন্তু তবু

ঘর মনে হলে এই চা-বাগানের ছবিটাই আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। এখানে দুঃখও অনেক, সুখও অশেষ। মায়ের সন্ধানে এখানে এসে, শিশুকালে মাকে না দেখে আমার কী যে কান্না প্রাণের ভিতরে গুমরে উঠেছিল তা বোঝানো যায় না। আবার যেদিন এক-একদল ছেলেহারা মা আনারসের কাঁটাগাছের বেড়ার আড়ালে তাদের কাদামাখা রোগা হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে দুপুরের রোদে-পোড়া মাটির উপরে চোখের জল ফেলত, যখন কোনো-কোনো দিন রাঙা শাড়ি, গালার চুড়িপরা ছোটো এক-একটা কালো মেয়ে চায়ের পাতা ছেঁড়বার সময় হঠাৎ আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'ভাই' ব'লে আমার গলা জড়িয়ে ধরত, তখনকার সুখ— সে তো বর্ণনা করা যায় না! তার পর, বসন্ত-কালে যখন ফুলে ফুলে, পাখির গানে, সোনার রোদে, সবুজ পাতায় বাগানে চারি দিকের বন ভরে উঠেছে, তখন কাজের অবসরে যখন এক-একবার চেয়ে দেখেছি তখনই যে আমার মাকে না দেখে আমি থাকতে পারি নি। ষাট বছরের মধ্যে আমার শরীর-মন এক-দিনের জন্যে অবসন্ন হতে দিই নি। এ-শক্তি আমার নিজের মধ্যে ছিল না, কিন্তু আমার মা যিনি, তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। এইজন্যে বাগানের সাহেব-মালিক আমায় ভালোবেসেছিল, আর মরবার সময় আমাকে তার চা-বাগানখানা লিখে দিয়ে গেল। তার আর কেউ ছিল না। সে ভালোবাসবার মধ্যে একমাত্র বাগানের কাজকে এবং সেই কাজ চালাতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত আমাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু সাহেব ভুল বুঝেছিল। আমি বাগান-খানাকে ভালোবেসেছিলেম— তার কেয়ারি-করা সাজানো চায়ের গাছগুলোর জন্যে নয়— ওই কাঁটাগাছের বেড়ার ধারে ধারে যে স্নেহ-ভালোবাসার লতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছিল তারই

জন্য। ওই বনের গাছ যেখানে ঝুঁকে প'ড়ে মায়ের মতো পথের ধুলোকে চুম্বন দিত, সেই ছায়াশীতল বনপথগুলির জন্য আমি আমার সমস্ত ভালোবাসা পুষেছিলেম ষাট বছর ধরে। চা-বাগানের ঠিক মাঝে, বাগানের যিনি মালিক তিনি নিজের কবর নিজেই বানিয়ে গিয়েছিলেন— কালো পাথরের ছুঁচোলো একটা পালিস-করা থাম, তার গায়ে সোনার অক্ষরে বড়ো বড়ো করে তাঁর নাম আর জন্মের তারিখ। তারই গায়ে তাঁর মরণের তারিখ লিখে আমি আমার বাগানের কাজ বন্ধ করলুম।

'শেষ-কুলির দল মাদোল বাজাতে-বাজাতে বন্দরের দিকে, দেশের জাহাজ, ঘরমুখো জাহাজ ধরতে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলার চাঁদ, নীরব বাগান, নিঝুম বনের গায়ে চমৎকার আলো ফেলেছে। আমি ঘরে আলো নিভিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছি, এমন সময় মাথার উপরে কচি গলায় কে ডেকে গেল, 'মা, মা, মা!' তার পর ছায়ার মতো একটা কে আমার ঘরের দরজা দিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল; মনে হল একটি ছোটো ছেলে। আমি লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লুম। বনের ধারে যেখানে একটা গুহা, যেখানে অন্ধকার মুখ-মেলিয়ে রয়েছে, সেইখানে সেই ছোকরার দেখা পেলুম। সে একজন কুলি।

'আমি তাকে শুধোলুম, 'সবাই গেল, তুই যে এখানে?'

'সে বললে, 'মা পালিয়েছে, তাকে ছেড়ে আমি যাই কেমন করে?'

'আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছি কোথায় তার মা, এমন সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, 'মীরসাহেব, ওই যে মা!'

'অন্ধকারে একটা ফুলের ডাল গুহার মুখে ঝেঁপে পড়েছে দেখলেম, আর কিছু না। ছেলেটা অকথ্য ভাষায় তার মাকে উদ্দেশ

করে গাল পাড়ছে শুনে আমি যখন অবাক হয়ে রয়েছি, সেই সময় একটা কালো পাখি উড়ে এসে তার কাঁধে বসল—'

মীরসাহেবের গল্পে বাধা দিয়ে আমি বললেম, 'গোল-বারান্দার নীচে সকালবেলায় আপনার এই জাহাজে ঠিক তেমনি একটা ছেলেকে আমি দেখেছি।'

মীরসাহেব হেসে বললেন, 'সে আমারই সঙ্গে আছে বটে। ছেলেটা সেই কালো পাখিটাকে দুই মুঠোর ভিতরে নিয়ে তাকে কেবলি চুমু খাচ্ছে আর গাল পাড়ছে; আর পাখিটাও বলছে, 'মা, মা, মা!' এমন সময় বন্দর থেকে শুনলেম কুলির জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে বললুম, 'জাহাজ তো বেরিয়ে গেল, তুই এখন কেমন করে দেশে যাবি?'

'ছেলেটা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে, 'দেশ তো আমার নেই।'

''তবে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলি।'

''যেখানে সবাই চলেছে।'

'আমি ছেলেটাকে আমার সঙ্গেই রাখলেম। 'মীরসাহেব, আপনার দেশ কোথায়' এই প্রশ্ন করলে আমি ছেলেটাকে বলি, 'দেশ নেই।' সে এখনো জানে, এই জাহাজে করে সে আর আমি আমাদের দেশ খুঁজতে বেরিয়েছি।'

আমি মীরসাহেবকে বললুম, 'ছেলেটা পাখিকে অমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়, আপনি ওর কাছ থেকে পাখিটা কেড়ে নিয়ে ধমকে দেন না কেন? আহা, পাখি যে এমন সুন্দর 'মা' বলে ডাকে, এ আমার কখনো শোনা ছিল না।'

মীরসাহেব বললেন, 'বাবুজি, ওই ছেলেটারই কচি গলার 'মা' সুর, পাখিটা সেই চা-বাগানের বড়ো দুঃখের কান্নার মাঝ থেকে শিখে নিয়েছে— ছেলেটার সবটাই গালাগালিতে ভরা নয়।'

এমন সময় সেই ছেলেটা নীল কোর্তা প'রে ছুটে এসে আমাদের বললে, 'আপনাদের জাহাজ এখনি ছাড়বে, শীঘ্র যান— কুয়াশা কেটে এখন রোদ উঠেছে।'

'মাতু' জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেল। দেখলেম, মীরসাহেবের জাহাজের তিনটে চোঙা দিয়ে পাখির বুকের পালকের মতো হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠছে। ফিরে এসে যখন আবার আমাদের জাহাজ ঘাটে লাগল, তখন মীরসাহেবের জাহাজ যেখানে ছিল সেখানে মস্ত একটা ফাঁক দেখলুম। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কুলির দল পাটের বোঝা বয়ে পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে মালখানার দিকে চলেছে; আর, একটা সোলার টুপি মাথায়, সাহেব ছড়ি হাতে তদারক করে বেড়াচ্ছে।

শেমুষি

সেদিন মান্থ্লি টিকিট রিনিউ করবার দিন ; তার উপর সাগর-যাত্রীর ভিড় ; স্টীমার-ঘাটে বিষম গোলমাল লেগেছে। জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব দেখে ব্রীজের ধারে ফুটপাতের উপর যেখানে অনেক-গুলো নাগা-সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে সেইখানে অশথগাছের তলায় আমি একটু দাঁড়িয়েছি, এমন সময় রাস্তার ওপার থেকে অবিন টিকিট কিনে হন্-হন্ করে আমার কাছে ছুটে এসে বললে, 'ওহে, শেমুষি দেখবে তো এসো।'

লোকের ভিড় ঠেলে জাহাজে উঠে দেখি ফার্স্ট ক্লাসে রোজ অবিন যেখানটায় বসে, সেইখানে একটা লোক ; চেহারাটা বেশ গম্ভীর, পরনে লুঙ্গি, গায়ে বেড়ালের লোমের একটা আলখাল্লা। আর, তার মাথায় একটা অদ্ভুত টুপি— তেমন টুপি আমি কখনো দেখি নি— কতকটা টোপর, কতকটা পাগড়ি, কতকটা যেন বিলাতি স্ট্র-হ্যাট !

স্টীমারে উঠেই অবিন আমার হাত ছেড়ে সেই লোকটার দিকে সোজা এগিয়ে চলল। আমি দেখলেম, অবিনের দুই চোখের মাঝখানে ভ্রূকুটি বিদ্যুতের মতো চম্‌কে গেল। অবিন যেখানটিতে রোজ বসে, লোকটা ঠিক সেইখানেই বসেছে ! তিন বৎসরের মধ্যে বেঞ্চের ঐ অংশটুকু থেকে অবিনকে বেদখল করেছে এমন লোক— কী সাদা, কী কালো— আমি তো দেখি নি। লোকটার কপালে কী আছে ভেবে আমি বেশ-একটু চিন্তিত হয়েছি, এমন সময় অবিন দেখি 'ইয়েঃ সম্‌স্' বলে লোকটাকে প্রকাণ্ড এক সেলাম বাজিয়ে অতি ভালোমানুষের মতো আমার পাশে, পিছনের

বেঞ্চিতে এসে বসল! লোকটা অবিনের দিকে ফিরেও চাইলে না; সে কেবল নিজের বাঁ-হাতখানা সাপের ফণার মতো বাঁকিয়ে অবিনের মুখের কাছে একবার তুলিয়ে গট্ হয়ে বসে রইল।

ঝুঁটি-কাটা ময়ূরের মতো অবিনকে একেবারে মুহ্যমান দেখে আমার আজ যেমন হাসি পাচ্ছিল, তেমনি বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। অবিনকে এরকম করে দমিয়ে দিতে পারে এমন লোক আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি তাকে চুপিচুপি বললুম, 'ওহে, এই ভাগীরথী-তীরে এবং নীরে এতকাল তুমি একা সিংহাসনে বিরাজ করছিলে। আজ আবার এ কোন্ ভাসুরক এসে উপস্থিত হল হে?' অবিন আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল ইঙ্গিতে চুপ করতে ব'লে, চোখ বুজে চুরুট টানতে লাগল। নদীর মাঝ দিয়ে সারা পথটা তার মুখে আজ কথা নেই। আমিও চুপ করে চেয়ে রয়েছি। দূরে দেখা যাচ্ছে, বালির চড়ার উপরে গোটাকতক নৌকো কাৎ হয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে সবুজ একটা আকের খেত; তার পিছনে একটা কলের চিম্‌নি থেকে একটু-একটু ধোঁয়া উঠছে; একটা শঙ্খচিল নীল আকাশ থেকে আস্তে-আস্তে জলের দিকে নামছে।

নদীনীর, বালুতীর, তুপুরের আলোয় মিলে আমাদের চারি দিকে যখন একটা দিবাস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে আর আমাদের জাহাজ-খানা কুটীঘাট থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে ওপারের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে, ঠিক সেই সময় অবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, 'ওহে সে-লোকটা গেল কোথায়?'

সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখি, সেই প্রথম-শ্রেণীর বেঞ্চখানা একেবারে খালি; সে অদ্ভুত টুপির আর চিহ্নমাত্র নেই। জাহাজ তখনো জেটি ছাড়ায় নি; আমি সেদিকে চেয়ে দেখলুম, জনমানব

নেই। গ্রামের পথঘাট পেরিয়ে সোজা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা মড়াখেকো কুকুর রাস্তার মাঝখানে ধুলোর উপরে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে রয়েছে ; আর অন্য পথিক কাউকে দেখা গেল না।

অবিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজের এধার থেকে ওধার, নীচের তলার কামরা মায় ইঞ্জিন-ঘরটা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজে এসে, সারেঙ থেকে সুক্‌নি খালাসি এবং সকল যাত্রীদের একে-একে সেই লোকটার হুবহু বর্ণনা দিয়ে জেরা করে দেখলে সে-লোকটাকে এ-জাহাজে উঠতেও কেউ দেখে নি, বসে থাকতেও কেউ দেখে নি, এবং কোনো ঘাটে নেমে যেতেও কেউ দেখেছে কি না তাও জানা গেল না। আমরা তুজনে গিয়ে সেই সাম্‌নের বেঞ্চিখানা এবং তার চারি দিকটা এমন করে সন্ধান করলুম যে, সেই লোকটার লোমশ আলখাল্লার যদি একগাছিও লোম সেখানে থাকত তবে সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়তই পড়ত। কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার ! লোকটা এল, বসল এবং চলে গেল অথচ পৃথিবীর কোনোখানে একটু আঁচড়ও পড়ল না ! কোনো-কোনো-দিন ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পারাপার করবার সময় দেখেছি, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, হঠাৎ একখানা নৌকো তার দাঁড়িমাঝি মালপত্র রসারসি নিয়ে চকিতের মতো কুয়াশার গায়ে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল ; এ লোকটা ঠিক যেন তেমনি করে আমাদের দেখা দিলে ! আমার মনের মধ্যে কেমন যেন শীত করতে লাগল।

প্রথম-শ্রেণীতে অবিনের সঙ্গে একলা বসে থাকতে আমার ভালো লাগল না ; আমি তৃতীয়-শ্রেণীতে যেখানে ইঞ্জিনের ধারে আগুনের তাতে কতকগুলা চিনেম্যান তাদের ফ্যাকাসে মুখগুলো তাতিয়ে নিচ্ছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

শেমুষি বেঞ্চ খালি করে দিলেও অবিন কিন্তু আজ তার নিজের

সিংহাসনে বসতে বড়ো উৎসাহ প্রকাশ করলে না। সে বেঞ্চিখানার পিঠে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে খানিক চুরুট টেনে টেনে, দোতলায় যেখানে সারেঙসাহেব চাকা ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটা দেখে জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে, মই বেয়ে সেখানে উঠে গেল। সাধারণ যাত্রীর দোতলায় যাবার হুকুম নেই, আমি নীচেই রইলুম। কিন্তু, অবিনের গতিবিধি সর্বত্র। সে দোতলার উপর থেকে দিব্যি আমাদের নাকের উপর দুই পা ঝুলিয়ে সারেঙসাহেবের হুঁকোর মজলিস জম্‌কে তুললে। সারা পথটা তার আর কোনো খবরই পেলুম না। ফিরতি স্টীমার যখন আহিরীটোলার ঘাটে ভিড়ছে, এমন সময় অবিন নেবে এসে বললে, 'ওহে, কাল আবার আসছ তো ?'

আমি বললুম, 'আসছি, কিন্তু এ-জাহাজখানার দিকেও আসছি নে !'

ঘাটে নেমে জাহাজখানার নাম দেখে নিলুম— প্রতিভা।

তার পরদিন থেকে বড়োবাজারের ঘাটে 'প্রতিভা'টি বাদ দিয়ে এ-লাইনের আর যত নামের যত জাহাজ সব-ক'খানাতে চড়ে বেড়াই, কিন্তু অবিনকে আর দেখতে পাই নে। সে যে কখন কোন্ জাহাজ ধরে যাতায়াত করে তার আর সন্ধান পাই নে। দূরবীন লাগিয়ে দেখেছি 'প্রতিভা'র ডেকে তার জায়গা শূন্য পড়ে আছে। লোকটা গেল কোথা ? শেমুষির মতো তাকেও গা-ঢাকা হতে দেখে আমি একদিন সন্ধ্যার সময় তাদের আহিরীটোলার ঘাটে নেমে জেটি পেরিয়ে অবিনদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি অবিন হন-হন্ করে স্টীমার-ঘাটের দিকে চলেছে ; সঙ্গে আলবোলা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে তার চাকর গোবিন্দ।

তখন সন্ধ্যা সাতটা হয়ে গেছে। বড়োবাজার থেকে শেষ স্টীমার রাতের অন্ধকারে ভেঁপুর শব্দ এবং সার্চ-লাইটের আলোর শুঁড় দোলাতে দোলাতে রক্তচক্ষু একটা বিরাট জলজন্তুর মতো আস্তে-আস্তে জেটির গায়ে এসে থামল। অবিনকে এতরাত্রে জাহাজে উঠতে দেখে আমার ভারি একটা কৌতূহল হল। আমি তার অসাক্ষাতে স্টীমারে উঠে থার্ড ক্লাসের একটা খালি বেঞ্চে শাল মুড়ি দিয়ে বসলুম। আমি, অবিন এবং গোবিন্দ ছাড়া আর একটি-মাত্র সহযাত্রী একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির আড়ালে চুপ করে বসে রয়েছে। জাহাজ অন্ধকার জল কেটে সন্তর্পণে চলেছে। তীরের আলোগুলো কালো জলের গায়ে সাপ-খেলানো সোনার এক-একটা রেখা টেনে দিয়েছে। আকাশের আর জলের আঁধার এক হয়ে গিয়ে নদীটা অকূল সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছে। এমন সময় অবিন আমার নাম ধরে ডেকে বললে, 'ওহে ইয়ার, শেমুষির অত কাছে বসা নিরাপদ নয় ; এদিকে চলে এসো।'

অবিনের চোখ এড়াতে পারি নি দেখে আমি তার কাছে গিয়ে বললুম, 'এখানে আবার শেমুষি কোথায় পেলে ?'

অবিন একবার ঝুড়ি কোলে যে-মানুষটা তার দিকে ঘাড় হেলিয়ে শুরু করলে, 'শেমুষি কি একরকম ? তারা নানা বেশে জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভিধানে শেমুষি অর্থে দেখবে বুদ্ধি।'

আমি বললুম, 'বুদ্ধিমন্ত জীবমাত্রেই যদি শেমুষি হয়, তবে তুমি-আমিও তো শেমুষি !'

অবিন বললে, 'না, ওই বুদ্ধির সঙ্গে অতির যোগ হলে তবে হয় শেমুষি। যেমন তোমার ঠগী, তেমনি শেমুষির একটা দল এখনো আছে। আমরা যেমন কালেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরোই, এদেরও মধ্যে তেমনি অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে হয় শেমুষি।

আজন্ম-শেমুষিও দু-চারজন আছে। তারা কেমন জান? হতভাগা লক্ষ্মীমন্ত, ধার্মিক ও পাজি, ভদ্র অভদ্র, মহাত্মা এবং দুরাত্মা, সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, পাজি ছুঁচো, মহাশয় দুরাশয়, পণ্ডিত ও গোমূর্খ, সমালোচক ও গোবদ্যি, বুজরুগ ও বেচারা একত্র মেশালে যা হয় তাই। এরা স্মরণমাত্রে যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে; ঘটি-চালানো, বাটি-চালানো থেকে মায় তোমার লোহার সিন্ধুকের ক্যাস্‌বাক্স পর্যন্ত সরানো— হোসেন খাঁর যত বুজ্‌রুগি সব এদের জানা আছে। এরা ইচ্ছে করলে অফুরন্ত তূণ, অক্ষয় কবচ, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি, বিশল্যকরণীর মলম— এমন-কি ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তোমার মুঠোয় এনে দিতে পারেন। স্বর্গের অপ্সরী এঁদের দাসী, দেবতাগুলো হুকুমের চাকর, আর ভূতগুলো ইয়ার। মনে করলে এক রাত্রের জন্যে এরা তোমাকে ইন্দ্রের অমরাবতীতে, কালীফের বোগ্‌দাদে, এমন-কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়ে আনতে পারেন অথচ তোমার গায়ে একটু ঘাম দেবে না। এমনি একজন শেমুষিকে সেদিন দেখেছ। কিন্তু, আজ যে ঐ ঝুড়ি নিয়ে ওধারে ভালোমানুষটি বসে আছে দেখেছ, ওকে চিনেছ?'

লোকটা আমার একেবারেই অচেনা। অবিন আমার কানে-কানে বললে, 'উনিই সেই দিনের শেমুষি; ওঁরই পাল্লায় একবার পড়ে একটা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটতে ছুটতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর-কি! আবার উনি যে কার সর্বনাশ করতে কিম্বা কার-বা কী ভালো করতে এখানে এসেছেন, তাই ভাবছি।'

লোকটার চেহারায় কোনো-রকম শেমুষিত্ব ছিল না। আমি অবিনকে বললুম, 'নির্ভয়ে তোমার শেমুষির ইতিহাস বলে যাও, ও-লোকটা এখনি নেমে যাবে।'

অবিন আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললে, 'দেখবে তবে?' বলেই অবিন তার বুকের পকেট থেকে একটা বনমানুষের হাড়ের বাঁশি বার করে বললে, 'এই হল শেমুষিদের বুকের হাড়ের বাঁশি। গান এবং এই বাঁশির সুর— এই দুই হচ্ছে শেমুষি তাড়াবার একমাত্র ওস্তাদ। তুমি গান ধরো ; আমি বাজাই।'

হাড়ের মধ্যে থেকে যে অমন সুর বার হয় তা আমার ধারণা হয় নি এবং অবিনও যে এমন বাঁশি বাজায় তা আমি আগে জানতেম না। ✓ সুর যেমন গিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করলে অমনি মনে হল, যেন রাত্রির নীল পর্দা খুলে দলে দলে তারা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে ; জলের শব্দ এতক্ষণ কানে আসে নি কিন্তু এখন যেন শুনি জলও ঐ সুরে, বাতাসও সেই সুরে তাল দিচ্ছে, আর মনে হল, রাত্রির রঙ ক্রমে যেন পাৎলা হয়ে আসছে। ✓

শিবতলার শ্মশানঘাটের কাছে জাহাজ এসে স্থির হল। পারে একটা চিতার আগুন ধূধূ জ্বলছে। সেই লোকটা ঝুড়ি মাথায় জেটিতে নেমে দাঁড়াল। আমি দেখলেম, সেটা ঝুড়ি নয়, সেটা তার সেই টুপিটা।

অবিন বললে, 'দেখলে?'

দেখতে আমার ভুল হয় নি কিন্তু শেমুষির সঙ্গে তার কী লড়াই বেধেছিল যখন তাকে প্রশ্ন করলুম সে বললে, 'ভুলে গেছি, মনে নেই।'

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সদাই হাস্যমুখ, ভায়া আমার মূর্তিমান আনন্দের মতো— পণ্টুনের পুলিশ থেকে জাহাজের যাত্রী সারেঙ খালাসি সকলের কাছে প্রিয় ; কেবল অবিন ডাকে তাঁকে 'প্রিয়া' বলে !

কবে কোন্ সূত্রে ভায়া যে আমার স্টীমারের 'শুশুক-সভা' বা ডল্‌ফিন্- ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট অবিনের কাছ থেকে এই সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা আমার মতো একজন নতুন-শুশুকের জানা সম্ভব নয় ; কেননা স্টীমারের ডেকে সবেমাত্র একটি শীতকাল কাটিয়ে আমি প্রথম বসন্তে পা দিয়েছি, সুতরাং শুশুক-সভার বাই-ল অনুসারে আমার এখনো দুধে-দাঁত ওঠে নি, আসল বয়েস আমার যতই হোক-না।

এখানকার নিয়ম-অনুসারে ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটা বছর, দিন আট-প্রহর, ষড়ঋতুর সব-ক'টাতে, জল-বাতাস-আলো-অন্ধকারে খেয়া দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, ঊনপঞ্চাশের বাতাসে পাল তুলে, পঞ্চাশের পারে যেখানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' বলে দিন-রাত ডাকছে, সেখানে আমার তরী নিরাপদে এনে ভেড়াতে হবে, তবে যদি পিয়ার খবর পাই ! আমার সবে ছেচল্লিশ, সুতরাং ঊনপঞ্চাশে, সুবাতাসের সঙ্গে পিয়ার খবরও আমার পেতে এখনো দেরি আছে— যদি না ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালোমন্দ একটা কিছু ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে কানে ঢোকে, যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জলখাবারের থালা ; যেটা বলব সে-

কাহিনীটা এমনি করেই আমার কাছে পৌঁছল।

হচ্ছিল সেদিন লাঠি-ভাঙার মামলা। অবিন আজ ক'দিন ধরে লাঠি ভাঙবার চেষ্টায় ফিরছে— কারো পিঠে নয় বটে, কিন্তু লাঠিবংশ তাতে করেও যে রক্ষে পাবে, এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল ভায়া আমার তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন। তিনি অবিনকে লাঠি ভাঙতে উস্‌কে দেবার মূলে ; সুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত শরীরে বর্তমান থাকবে, সেটা আশা করা অন্য লোক হলে যেত না, কিন্তু তিনি অবিনের প্রিয়া-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত জাহাজের মধ্যে এখন দুটিমাত্র লাঠি। এক ভায়ার হাতের ঘোড়ার কাটা-পা-দেওয়া আবলুসের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশির উপরে মিনের কাজ করা আধা-পাখি আধা-মানুষ একটি কিন্নরী-বসানো হিমালয়ের দেবদারু-যষ্টি।

এই দুই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধল, সেদিন জলে-বাতাসে মেঘেতে-আলোতে কোনো বিবাদ ছিল না। এমন-কি, ওস্তাদি রাগরাগিণী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলো নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। ✓একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই ; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে, আস্তে পড়ছে। সূর্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণচাঁপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারই উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি। ভরা পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী তেমনি যেন চম্পাই রঙের প্রকাণ্ড পালখানি তুলে রাত্রির মুখে স্বচ্ছন্দগতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ায়। প্রাতঃসন্ধ্যার অরুণোদয়ের তপ্তকাঞ্চনের

সঙ্গে কতটা হিম মেশালে সায়ংসন্ধ্যার এই চাঁপাফুলি আলোর রঙটি পাওয়া যায়— এটা যখন আমি বিশ্বকর্মার কাছ থেকে মনের নোট্-বুকে টুকে নিচ্ছি থার্ড ক্লাসের একখানা বেঞ্চির কোণে বসে, সেই সময় ফার্স্ট ক্লাসের দিকে 'করেন কী' 'করেন কী' রব উঠল।

কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কি না দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি, অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তার নিজের লাঠিখানা ধনুকের মতো বেঁকিয়েছে ; তার মুখ গোলাপফুলের মতো রাঙা ; আর-একটু হলেই লাঠিখানা দু-টুকরো হয়ে গঙ্গা পাবে। ভায়াই যে আজকের ধনুকভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উস্‌কে দিয়েছেন, এটা বুঝলুম। অবিনের লাঠিটা এত সুন্দর যে সেটাকে ভেঙে ফেলা আর একটা মানুষের ঘাড় মটকে জলে ফেলে দেওয়ায় আমার কোনো তফাত মনে হল না। মানুষের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও যা ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই, একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথায় সেই কিন্নরীর বাঁশির সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল, 'বাঁচাও, বাঁচাও!' আমার বুকের মাঝে কেমন করতে লাগল। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম, লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে নুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে পারি নি। পাহাড়ের রস টেনে বেড়েছিল সেই সরু দেবদারুর ডাল। অবিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ভাঙতে পারলে না। লাঠিখানা বেঁকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিশ্বাস ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম, সেই নিশ্বাসের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঁশুটে হয়ে গেল। যেন একটা

দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আমাকে সেই লাঠিটা দিয়ে বললে, 'নাও, তোমাকে দিলুম।'

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প হিসাবে খুব মূল্যবান সুতরাং সহজে বখশিস নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু, একবার দিয়ে ফিরে নেওয়া অবিনের কুষ্ঠিতে লেখে নি, সুতরাং অন্তত তখনকার মতো হাস্যমুখে লাঠিটা আমায় নিতে হল। তা ছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার প্রিয়া— আমার ভায়াটির কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে সব দিকেই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুশির সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বখশিস নেবার আর-একটা কারণও বটে। কাজেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাড়াতাড়ি এক কোণে সেটাকে রেখে আমি গায়ের কোট ছেড়ে রাখব, এমন সময় বাতির আলোয় লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা নাম ঝলকে উঠল— 'ইন্দু'। ✓তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই নাম লেখা।✓ লাঠিটা বাইরে ফেলে রাখতে আমার আর সাহস হল না ; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে শুলুম। অবিন লাঠিটাকে কী ভাবে দেখত তা জানি নে, কিন্তু তার ইন্দু বা ইন্দুমতী অথবা ইন্দুমুখীর লাঠিটা আমার যেন বৃদ্ধস্য তরুণীর মতো, চলিত কথায় অন্ধের নড়ি হয়ে উঠল। পাছে তাকে হারাই, পাছে সুড়ঙ্গ কেটে চোর আমার কোলের কাছ থেকে চুরি করে পালায়, এই ভাবনাতে আমার খেয়ে সুখ ছিল না, শুয়ে ঘুম ছিল না।

কদিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা তখন প্রথমে আমার ভয় হল, অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়— যদিও অবিনের কোনোদিন এমন স্বভাব নয়, বেশ জানতেম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর করে মুঠোর ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই

হবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, গঙ্গার একটা মনোরম শোভার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে। পশ্চিম তীরে দেখতে পাচ্ছি, সাহেব-মিস্ত্রির বানানো রাজাদের একটা পুরোনো বাগানবাড়ি; পুব পারে দেখছি প্রকাণ্ড একটি মন্দির, ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের জাহাজ থেকে এই ঘাটের কোল পর্যন্ত রচনা করেছে। আর, এই আলোর পথের ধারটিতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অবিন, পূর্ণিমার চাঁদের দিকটিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর আমার হাতের মুঠোর মধ্যে হীরের বিন্দু দিয়ে লেখা নামটার মিল দেখে মনটা আমার নড়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল, অবিন হয়তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে; হয়তো এই চাঁদের আলোয় ঝক্ঝকে তারাগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর পথে, বহু দিনের পথে, প্রাণের আকূতি বিরহী যক্ষের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে, প্রতি পূর্ণিমায়! হয়তো পূর্বজন্মে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তন্বী শ্যামা ইন্দুরেখা কিন্নরী। হয়তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার কুঞ্জবনে অবিনে-তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রণয়স্বপ্নের মাঝখানে দুজনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে খসে-পড়া দুটি তারার মতো পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া!

এখানে এসে স্বপ্নটা আমার যেন আট্কে গেল। ওই আহিরীটোলার গলিতে যে অলকার কিন্নরী ইন্দুরেখা— ইন্দুবালা চক্রবর্তী, ইন্দুমুখী ঝাঁ, ইন্দুমতী মুন্সি কিম্বা আরো কোনো-একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিণীপনা করতে করতে অথবা অবিনের সঙ্গে কোর্টশিপ্ চালাতে চালাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে হঠাৎ মারা পড়ল

অবিনকে তার শেষ-দান এই লাঠিটা দিয়ে, এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম, সে আমার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। আমি লাঠিটা সজোরে ঠুকে বলে উঠলেম, 'এ হতেই পারে না।'

অবিন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললে, 'কী হতে পারে না হে আর্টিস্ট?'

আমি উত্তর করলেম, 'আকাশের চাঁদের ভূতলে পতন! ইন্দুরেখা কিন্নরীর তোমার আহিরীটোলায় গৃহিণীপনা!'

অবিন গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িটা দেখিয়ে বললে, 'ইন্দুরেখা ও-পাড়ার ইন্দুভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে?'

'কিছু না।'— বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ যাকে দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে দিলেম। কিন্তু, সম্পূর্ণ অবস্তু ইন্দুরেখার সোনার কাঠিটা আমারই মুঠোয় রয়ে গেল— হাতের মুঠোয় নয়, মনের মুঠোতে।

অরোরার সঙ্গেও যে অবিনের পরিচয় ছিল সেটা আমি জানতেম না। সে কবিতা করে, সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি ; রামধনুকের সঙ্গে তার আলাপ থাকা সম্ভব ; কিন্তু অরোরার বাসা ; সেখানেও যে তার গতিবিধি, এটা একেবারেই আমি ভাবি নি।

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল—ঠিক যেখানটিতে চাপা এবং যে-রাজ্যটা বেশ একটু গভীর সেইখানেই চিরশীতল মণিমন্দিরে না-দিন না-রাত্রির দেশে একাকিনী অরোরা আলো বিতরণ করেন। লক্ষকোটি রামধনুকের শোভা এক ক'রে ঝালর বানিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে যে-বাহার, বিনা বরের বাসরে অরোরার রূপ কতকটা সেই ধরণের। নব নব সৌন্দর্যের রঙের এবং আলোর সে যেন একটা ভরা জোয়ার বা চীনাভাষায় যাকে বলে 'টাইকুং'।

অরোরা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা আমার দূর থেকে। জল-জীয়ন্ত অরোরার বাসায় গিয়ে তার নির্ভুল পরিচয় এ-পর্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নি ; কেননা সেদিন পর্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলেম যে-দলের কাছে রামের ধনুক, অরোরার রঙ্গমঞ্চের রঙ, এমনি আরো অনেকগুলো জিনিস হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পটোল ঝিঙে ইত্যাদির মতো একেবারে বর্জনীয় ছিল। আমি তখন কি জানি যে তলে-তলে আমার দলেও সব চলে ? সেটা জানলে ও-দল থেকে নাম-কাটা সেপাইয়ের মতো অবিনের দলে এসে ভর্তি হবার দরকার ছিল না।

যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে তারার জুঁইফুলে সাজানো

নীল আকাশের নীচে, কলকাতার অন্ধকার গলিতে, আমরা দুই বন্ধু যে অরোরার বন্ধ খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে, রাত সাড়ে-চারটেয় আহিরীটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম, সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে-লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না— অবিনের দলে মিশে এটা একটা সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর কখনো অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কি না বলতে পারি নে। তবে আমার সঙ্গদোষেই যে এরূপটা ঘটল, পয়লা এপ্রেলের ঠিক পূর্বরাত্রে আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে নিলেম। কেননা দল ছাড়বার পূর্বে, আমার আগের দলের যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বিশেষ করে আমারই উপরে দীর্ঘনিশ্বাস ও হুঙ্কার-গুলো নিক্ষেপ ক'রে— পিতৃপুরুষের সঞ্চয়টার সঙ্গে নিজের উপার্জিত পয়সা রূপ গুণ ও যৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনায়— ইংরাজিতে এপ্রেলের ওই সম্ভাষণটাই আমাকে দিয়েছিলেন, যদিও মাসটা ছিল অন্য !

খানিক বসে থেকে অবিন মরীচিকামুগ্ধ হরিণের মতো অন্ধকারে আর-একবার তার অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল অলিতে গলিতে। আমি একা ঘাটে, যেখানটিতে সকালের একটি তারার আলো অনেক দূর থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের উপর নেমে দাঁড়িয়েছে, সেইখানটিতে চুপ করে বসে রইলেম। ভোরের হাওয়ায় তখনো হিম মাখানো ; নদীর মাঝে ময়লা কুয়াশা গত শীতের ছেঁড়া কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে। ঘাটের দু ধারে বাঁধা সারি সারি বোঝাই নৌকো জলের ধাক্কায় ঘুম

ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছু দূরে শ্মশানঘাটের সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে। চলে যাবার সময়, জ্বলে ছাই হয়ে যাবার বেলায়, মানুষ কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কী আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে যে হয়তো জীবনের অন্ধকারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন।

অন্ধকারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে; শিখাগুলো যেন হাত নেড়ে আমায় ডাকতে লাগল। মন আমার প্রদীপের চারি দিকে পতঙ্গের মতো কতক্ষণ ধরে ঐ আগুনটার চারি দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অন্ধকারে একখানা হাত যেন বোধ হল আমার দুই চোখের উপর আস্তে আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত— চাঁপাফুল আর হেনার গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি; পাৎলা একখানি আঁচল, হাল্কা বাতাসের মতো উড়ে উড়ে আমার গালে পড়ছে; ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ-ভরা গরম একটা নিশ্বাস অনুভব করছি! আশ্চর্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারই মতো স্নিগ্ধ সুন্দর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি-চুপি বললেম, 'অরোরা!'

পিছন থেকে অবিন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

আমি চমকে উঠে বললেম, 'কি হে, তুমি? অরোরা কোথা!'

অবিন তার আঙুলটা দিয়ে শ্মশানের চিতা দেখিয়ে বললে, 'শোনো বলি—'

সকালের হাওয়ায় কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম পারে চিতার

আগুন নিভে গেল। তারই শেষ আভার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পুব-পারের আকাশে ফুটে উঠল। অবিন তার কথা শুরু করে এমন সময় রামা বেহারা এসে খবর দিলে, 'ডাক্তারবাবু আয়া।'

এত রাত্রে এখানে ডাক্তারবাবু কেন, বুঝতে আমার সময় লাগল। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বললেম 'তুমি যে অসময়ে ?' ডাক্তার হেসে বললেন, 'আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন ? এরকম করলে আপনার অসুখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন ; যান, জাহাজে একটু বেড়িয়ে আসুন।'

লেখবার টেবিলে এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাঁজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিয়রে বড়ো বড়ো অক্ষরে এপ্রেলটার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়ল। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে সুবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ করলেম। ঘড়িতে তখন বেলা দুটো-উনপঞ্চাশ।

পর্-ঈ-তাউস্

ওপারে মুচিখোলার নবাবি নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে দুই বন্ধুতে পা ছড়িয়ে চড়ুইভাতির পরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি— ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-একবার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।

সেদিন একটা ভাঙা খাঁচা জলের স্রোতে ভেসে চলতে দেখে আমি অবিনকে তামাশা করে বলেছিলেম, 'ওহে, খাঁচাটা নবাবের চিড়িয়াখানার দিক থেকে যখন ভেসে আসছে, তখন এটা পক্ষী-রাজের খাঁচা হলেও হতে পারে। দেখো-না সাঁৎরে, যদি ওটাকে ধরতে পার।' অবিন সাঁতার একেবারে না জানলেও সেদিন যে ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর খাঁচাটা না তুলে তাকে জেলে ডেকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে আমার সঙ্গে যে-আড়িটা দিয়েছিল, চিরদিন সে-কথা আমার মনে থাকবে।

এখন সে-কথা অবিন ভুলে গেছে; কিন্তু পক্ষীরাজ তার সেই যৌবনের দুঃসাহস বোধ হয় ভোলে নি; তাই হঠাৎ আজ তার স্থূলশরীর কাশীপুরের ঘাট থেকে জাহাজে আমাদের দর্শন দিতে এসে উপস্থিত। গোছা-গোছা ময়ূরের পালক হাতে সে লোকটা! কী অদ্ভুত যে দেখতে তাকে, তা আর কী বলব! ভণ্ডামির যতরকম পালক হতে পারে সব-ক'টা দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে।

ছোটো ছেলে পাখির ছানা হাতে পেলে টিপে-টুপে পালক ছিঁড়ে যেমন করে, অবিন ঠিক তেমনি এ-লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। অবিনের গায়ে তুলো-ভরা ছিটের কালো কোট। এ-লোকটাকে ময়ূরপুচ্ছে বিচিত্র দেখে আমার কথামালার দাঁড়-

কাকের গল্পটা মনে পড়ল। আমার তুলনাটা ইংরিজিতে অবিনকে শুনিয়ে দিতেই সে-লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'তোমার বন্ধুর কোটের নক্‌শাটা ভালো করে কি দেখা হয়েছে? ওটা যে আগাগোড়া ময়ূরপালকে ভরা!'

বলেই লোকটা উত্তরপাড়ার ঘাটে লাফিয়ে পড়ল, গাঁজার বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে। আমি অবিনের কোটের দিকে চেয়েই একেবারে ঘাড় হেঁট করলেম।

আকাশে একটা রামধনুক ময়ূরের পালকের রঙ ধরে দেখা দিয়েছে। আবার যখন মুখ তুলে চাইলেম তখন সব-প্রথম ঐটেই আমার চোখে পড়ল। আমি অবিনকে সেটা দেখাব বলে ডাকতে গিয়ে দেখি, অবিন সেখানে নেই। আশে-পাশে কোনো সহযাত্রী দেখলেম না; জাহাজের ডেক সমস্তটা খালি পড়ে আছে। তারই এক কোণে আমাদের বাঁয়াতবলা-জোড়া পড়ে ছিল। হঠাৎ সে-দুটো দেখি, দুখানা করে পালকের ডানা বের করে পাখির মতো উড়ে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালি বেঞ্চিগুলো একে একে পালক গজিয়ে পক্ষীরাজের মতো লাফাতে লাফাতে ডেক্‌ময় ছুটো-ছুটি করতে করতে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিলে।

আমাকে না জানিয়ে বন্ধুরা সবাই হয় মাছের মতো, নয় পাখির মতো, পাখা না-গজিয়ে কেমন করে এই মাঝগঙ্গা থেকে সরে পড়লেন, বেঞ্চগুলো আর ডুগ্‌ডুগি দুটো কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগল, এ-কথা যেমন আমার মনে উদয় হয়েছে অমনি দেখি— স্টীমারখানা দু পাশে দুটো প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে সোজা সেই আকাশ-জোড়া ময়ূরপুচ্ছের মতো রামধনুকের ফটকটার দিকে উঠে চলল।

জল ছেড়ে শূন্যে খানিক ওঠবার পর দেখছি, অবিন উপরতলার

সারেঙের কুট্‌রি থেকে উঁকি মেরে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। তার পাশে সেই ময়ূরের-পালক-ওয়ালা অদ্ভুত মানুষটা আমাদের! আমি এদের কোনো কথা বলেছিলেম কিনা মনে নেই, উত্তরে একটা খুব গম্ভীর গলায় শুনলেম, 'পালকের জাদুঘরে চলেছি ময়ূর-পুচ্ছধারীদের সপ্তম স্বর্গে!'

স্বর্গ এবং জাদুঘর এর একটাতেও যাবার মতলবে আমি বাড়ি থেকে রওনা হই নি। তরী আমার বেরিয়েছে জোয়ার ঠেলে; ভাঁটা কাটিয়ে ঘরে ফিরব, এই কথাই মনে ছিল। কাজেই আমি খুব চেঁচিয়ে বললেম, 'জাহাজ ভেড়াও, আমি নামতে চাই।'

কিন্তু, জাহাজ তখন তার তরুণী-রূপ ছেড়ে পাগলা পক্ষীরাজ হয়েছে। আর, চালাচ্ছেন তাকে সেই পালকধারী! কাজেই কোনো ঘাটেই যে সে না দাঁড়িয়ে বরাবর রামধনুকের মট্‌কায় গিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে হঠাৎ থামবে, তার আর বিচিত্র কী!

তিনটেতে আমরা পক্ষীরাজের পিঠ থেকে জ্বলন্ত উল্কার মতো কেন যে এতক্ষণ মহাশূন্যে ঠিকরে পড়ি নি, এইটেই আশ্চর্য! ময়ূরের পালকের ডগায় মাছি যেমন, তিনটিতে আমরা তেমনি সাত রঙের একটু কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে শূন্যে দুলছি, এমন সময় আমাদের পাণ্ডা সেই ময়ূরপুচ্ছধারী মানুষ-দাঁড়কাক রামধনুর ডগায় স্থির হয়ে বসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। সেখানে কী আশ্চর্য পাখিরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সেদিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মতো নীল, কখনো সকালের আকাশের মতো সোনালি, সন্ধ্যার আকাশের মতো রাঙা, জলের মতো ঝক্‌ঝকে রুপালি, ধানের খেতের মতো ঠাণ্ডা সবুজ। এই-বা নতুন পাতার মতো টাটকা, এই ঝরা পাতার মতো মলিন্। রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারই মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল

শিশু, পাখির ঝরা পালক উড়িয়ে উড়িয়ে ছড়াছড়ি ক'রে তপোবনে শকুন্তলার মতো।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে, এরাই হচ্ছে পরী।'

পাণ্ডা একটু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে, না। এরা হল রামধনুকের প্রাণ। এরা আছে বলেই রামধনুকে রঙ আছে। পরী দেখতে চান তো ওই দিকটায়, যেদিকটায় পালকের জাদুঘর, যেখানে পালকের দাম আছে।'

এই বলে তিনি দক্ষিণে প্রায় দক্ষিণ-দুয়ারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'ও-ই যে দেখছেন দুখানা ডানা বেঁধে হাত দুটি বুকে রেখে, ওঁরা হলেন মানুষ, কেবল ডানার খাতিরে আমরা বলি ওঁদের এন্‌জেল্; আর-কোনো তফাত মানুষের সঙ্গে নেই। আর ওই দেখুন গরুড়কে। শুধ্ ডানা নয়, পাখির ঠোঁটটা পর্যন্ত মুখোশ করে প'রে দাস্যরসের রাজসিংহাসন আপনার রামা চাকরের হাত থেকে বেদখল করে নিয়ে বসে আছেন। ওই ঠোঁট আর ডানা বাদ দিলে উনি মানুষমাত্র। আর, ওই দেখুন বৃন্দাবনের শুক সারী। এঁদের রাজা গরুড় তবু প্রভুর সেবার জন্যে মানুষের হাত দুখানা রেখেছেন; কিন্তু এই গরুড়ের চেলা সেবাদাস-সেবাদাসীগুলি নিজেদের টিয়াপাখির খোলসে সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলে আসলটাকে একেবারেই গোপন ক'রে দিব্যি সুখে বিচরণ করছে। মানুষ যখন পালকের শিল্পে খুব বিচক্ষণ হয়ে ওঠে নি, অর্থাৎ তাদের গোঁজা পালক ও পাখনা সহজেই লোকের কাছে ধরা পড়ত, এরা তখনকার জীবের আদর্শ। এ অংশটাকে জাদুঘরের পুরানো অংশ বলা যায়। এর পরেই ওদিকে ঐতিহাসিক যুগের জীবগুলো। ক্রুজেডারদের মতো পালক তারা কেবল মাথার ঝুঁটিতে রেখেছে, বাকি সমস্ত দেহে লোহার সাঁজোয়া দিয়ে অনেকটা পাখির ধরণে

নিজেদের সাজিয়েছে। এই সময় থেকে ডানার চাল উঠে গিয়ে পালকের ঝুঁটি বাহাদুর লোক মাত্রেরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে উঠল। টুপিতে, পাগড়িতে, মুকুটে, ঘোড়ার মাথায়, পালক-গোঁজার যুগ এটা! ময়ূরের পালক, বকের পালক, কাকের পালক, চিলের পালক, উটপাখি— ঘোড়াপাখি— সবার পুচ্ছ এরা বহন করেছে নিজেদের পুচ্ছ খসিয়ে রেখে। তার পর আধুনিক যুগের জীব দেখো। এখানে একদল শিরে-পুচ্ছ দেখা যায়; একদল দেখা যায় পালকের কলম-পেশা; আর একদল সম্পূর্ণ পালক গোপন করে পালকধারীর রাজা হয়ে কেবল পালকের রঙ গেরুয়া সাদা কালো ইত্যাদি গায়ে মেখে রাজত্ব করছে— কেউ আদালতে, কেউ বিদ্যালয়ে, কেউ ছাপাখানায়, কেউ ডাক্তারখানায়, প্রকাণ্ড পালকধারীদের কন্‌গ্রেসে কন্‌ফারেন্সে, স্ব-স্ব-দেশে। এর পরে যে-যুগ আসবে তার সোনার ডিম পালকের গদির উত্তাপে এখনো সিদ্ধ হচ্ছে। এই ডিম ফুটে যে বার হবে তার পালক পিঁপড়ের পিঠের দুখানি ডানার মতো হঠাৎ গজাবে, এইরূপই পণ্ডিতেরা বলেন। আর, সেই অদ্ভুত জীবের জন্মদিনের শোকোচ্ছ্বাসগাথা লেখবার জন্যে ময়ূরের ডানার গেরুয়া রঙের পালকের কলমটা কানে গুঁজে যে আসবে তার স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন এখন হতে বিলি আরম্ভ হয়েছে দেখো।'

বড়ো বড়ো শিল, পালক, ধুলোবালি, মুঠো মুঠো ঝুড়ি ঝুড়ি আমাদের মাথায় মুখে চোখে পড়ছে। রামধনুক আঁকড়ে আর থাকা চলে না। এর মধ্যেই তার সাত রঙ ফিকে হতে শুরু হয়েছে; সম্পূর্ণ গলতে সাত সেকেণ্ডও লাগবে না।

এই ঝড়ের মুখে অবিন তার পালক-ছাপা কোটের বোতাম এঁটে, পাণ্ডাজি তাঁর ময়ূরপালকের চামর বাগিয়ে, উড়ে পড়বার জোগাড় করছে দেখে আমি বললেম, 'ওহে, আমার উপায়?

আমার তো পালক নেই। আছে মাত্র গায়ে এই কাশ্মীরের পরীতোষ শাল। এর নাম পরী বটে, কিন্তু এর পালক মোটেই নেই। একে নিয়ে তো ওড়া চলবে না ?'

'খুব চলবে। ওকে বুঝি বলে পরীতোষ ? ওর ফার্সি নাম হচ্ছে পর্‌-ঈ-তাউস্‌। ময়ূরের পেখমের গোড়াতে যে ছাই রঙের নরম পালক লুকোনো থাকে, তাই দিয়ে এটা প্রস্তুত। বাদশারা তক্ততাউসে এই শালের বিছানা লাগাতেন ; এখন আমরা গায়ে দিয়ে থাকি। ভয় নেই, উড়ে পড়ো।'

মাথা থেকে পা পর্যন্ত শালখানা মুড়ি দিয়ে রামধনুকের মটকা থেকে ঝুপ ক'রে আবার যে-জাহাজ সেই-জাহাজেই নেমে পড়লেম। চোখ খুলে দেখলেম, যেখানকার সেইখানেই আছি— পূর্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা হাঙর, কিন্তু আমি বলছি, 'না, না, না!'

বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জেলেদের জালে এই যে জিনিসটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট্ শুশুক-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাহন, জীবনশূন্য শুশুকের খালি মোযোক বই আর কিছু হতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব সব সভ্য মিলে খুব ঘটা করে লেট্ সভার শ্রাদ্ধ করা। গঙ্গায় তখন তপসী মাছ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল, এবং আমাদের মুখুজ্জেমশায় আমার খাতিরে ও শুশুকের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ভোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ায় যতরকম পটোল বাজারে আসে ও খেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমার সে-প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই করলেন না। আমাদের লেট্ সভার সদ্গতি হল না; উৎপাত শুরু হল জলে স্থলে সভার সভ্যদের উপরে; দেশে বিদেশে আমাদের কজনের উপরে উৎপাত শুরু হল। হৃষীকেশে দুজন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো রুই-কাৎলা ছিপে ধরে মৎস্যহিংসা করে বসল। এতে শুশুক-সভার সমস্ত হিঁদুসভ্য বিষম ব্যথা পেলেন। এদিকে আবার আমাদের বাঁড়ুজ্জেমশায় কুটিঘাটা থেকে উত্তরপাড়া পর্যন্ত বেড়াজাল ফেলেও আর তপসী মাছ গ্রেফতার করতে পারলেন না। সমুদ্র ছেড়ে গঙ্গার খালে তপস্যা করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে, এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা গেল না।

তার পর, উত্তরপাড়ার মালিনীকে আমাদের মুখুজ্জে অভি-সম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি

করতে পারলেন না। নিমতলার অবিনাশবাবু আমার ছেলেবেলার বন্ধু হয়েও আমার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন ; অজুহাত যে, আমি 'ভারতী'তে ইদানীং যে-গল্পগুলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি, সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ করে গালাগালি দেবার মতলবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই সূক্ষ্মশরীর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয়, এটা আমি কিছুতেই অবিনাশবাবুকে বোঝাতে পারছি নে।

শেষে, এই মাসে ঘোড়া-লাভ আমার কুষ্টিতে পষ্ট করে লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামিজিও বললেন, এবারের ডার্‌বিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো আমারই দিকে আসছে। কিন্তু, এ সত্ত্বেও আমার অশ্বমেধ পণ্ড করে ঘোড়াটা পথ ভুলে অন্যের আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল!

এই-সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-কয়ে জাহাজ ছেড়ে একেবারে নৈমিষারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম, 'বিফল জনম, বিফল জীবন' একতারাতে এই গান গাইতে-গাইতে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াটা কিম্বা তার ডানার এক টুকরো কাগজও যদি তখন— যাক সে দুঃখের কথায় আর কাজ নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে সবে ডুবটি দিয়ে উঠেছি, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাত ধরে বললেন, 'ব্যস্ করো, বেটা, চলো হরদোয়ার্‌মে কুম্ভকা অস্নান্ করেঙ্গে।'

কী জানি সন্ন্যাসীঠাকুরের কী শক্তি ছিল, আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে

গিয়ে দেখি পায়ে ধুলো নেই! আমি তখনি বুঝলেম, ঠিক লোক পেয়েছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বললেম, 'ছলনা করছ, ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার এক দিন এক রাত্তিরের পথ; আর পাঁজিতে লিখছে, আজ একটা-উনপঞ্চাশে হল কুম্ভ!'

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, 'বেটা, কুম্ভকা অর্থ ক্যা আগে তো সমঝ্‌লেও!'

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আস্তানা মণিকর্ণিকার শ্মশান বেশিদূর হবে না; কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা, পূর্ণকুম্ভর ঘড়ার মতো শুধু গঙ্গাজলে ভরা নয়, সেটা ঠাকুর যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক নিমেষে অর্থে ভরিয়ে দিতে পারেন, আকাশকুসুমের মতো দেখালেও ডার্‌বি-খেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরই দ্বারা হতে পারবে, আর কারো দ্বারা নয়, এটা আমার বিশ্বাস হল। আমি ভক্তিভরে, গদ্‌গদভাবে বাবার ঠিক পিছনে পিছনে চললেম। কাগজের অর্থ নয়, রূপেয়া-ভরা কুম্ভও নয়, চক্‌চকে আকবরি-মোহরের ঢাকাই-জালা তখন আমার যেন চোখের সামনে উদয় হয়েছেন, এমনি বোধ হতে লাগল।

আমি বাবাকে নির্জনে আপনার মনের দুঃখ জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে থাকতেই জানতে পেরেছিলেন। তাই আজ আমার ধৈর্য পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন তিনি প্রায় বারোটা পর্যন্ত কাশীর বাঙালিটোলার অলিতে গলিতে ঘিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু, আমি জেনেছিলেম যে, এবার ঠিক-লোকের নাগাল পেয়েছি। সোনা করবার ভস্ম, গাছ চালাবার মন্ত্র, এমনি একটা কিছু এবার আর না-হয়ে যায় না। কাজেই খিদেতে তেষ্টাতে ভিতরটা আমার

শুকিয়ে উঠলেও, আমার চোখকে আমি একটুও শুকোতে দিলেম না, প্রেমাশ্রুতে বেশ করে ভিজিয়ে রেখে দিলেম।

যখন আশ্রমের দরজায়, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে বললেন, 'আউর ক্যা ? কুম্ভ আউর উস্‌কা অর্থ তো মিল্ গিয়া। আভি ঘর যাও।'

এখনো পরীক্ষা ! ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে, 'ঘরে গিয়ে ভাত খাওগে !' আমি খুব জোরের সঙ্গে বললেম, 'বাবা, অমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখেনে পড়ে রইলুম ; কৃপা করতেই হবে। বাবার কাছ থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছি নে। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।'

বাবা আমার কথার আর-কোনো জবাব না দিয়ে আটা আর ঘি মেখে রুটি সেঁকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃক্‌পাতও করলেন না।

দুপুরের রোদে আমি একলা মুখ শুকিয়ে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা, তোমার কাছে কিছু টাকাকড়ি আছে ?'

কী আশ্চর্য ! একেবারে বাংলা কথা, টানটোন সব বাঙালির মতো, কিচ্ছু বোঝবার জো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোট্টা !

'পয়সা থাকলে কি আমার এমন দশা হয়, বাবা !' বলেই আমি চোখ মুছতে থাকলেম।

বাবাজি তখন আমাকে কাছে বসিয়ে, পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তাতে আর দুক্‌খু কী ! আমি বুঝেছি, তোমাকে এই কুম্ভমেলার দিনে একলা দশাশ্বমেধে ডুব দিতে দেখেই আমি বুঝেছি— থার্ড ক্লাসের ভাড়াটা পর্যন্ত তোমার অভাব। তা, কেঁদো না, বাবা, আমি এখনি তোমাকে কুম্ভস্থলে পাঠাব। এই ঘটিটায়

ইঁদারা থেকে একটু জল আনো তো।'

আমার তখনো মোহ কাটে নি। হরিদ্বারে কুম্ভস্নান আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয় যখন কাশীতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি, হিন্দু ইউনিভারসিটির ঘড়ির কাঁটা একটা-উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে প্রায়! যেমন এই কথা মনে করা, অমনি বাবা তাঁর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। ব্যস্, একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের লোটাটি পর্যন্ত আমার হাতে-হাতে হরিদ্বারে এসে হাজির! অবশ্য, হরিদ্বার আমি এর পূর্বে দেখি নি। কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝেছিলেম, ঠিক-লোকটি পেয়েছি, এবারেও তেমনি বুঝলেম, ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌঁচেছি। শুধু তাই নয়, মনে হল, যেন এইখানে আমি অনেক দিনই এসেছি; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক-কোমর বরফ-জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্ছি, আর থেকে থেকে ডুব দিচ্ছি। চারি দিকের লোকজন, পাহাড়পর্বত, মন্দিরঘাট সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগল।

এক রাজা হাতি ঘোড়া লোক লস্কর আর বন্ধ দু-তিনখানা পাল্কি-সুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পাল্কিগুলো বুঝি সোনার পাল্কি হয়ে যায়, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বুঝি-বা রাজা-রাজড়া হয়ে দেখা দেয়, এই ভেবে আমি সেদিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটা মোটা-পেট পুলিশ-ম্যান পিছন থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বললে 'এ বাবু, ক্যা দেখ্‌তা? ভাগো হিঁয়াসে।'

আমি পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কুল্‌কুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারি দিক থেকে যেখানকার যত পাণ্ডা 'হাঁ হাঁ, করলে কী! গঙ্গায় কুল্‌কুচি করলে! সবার স্নান মাটি হল!'

ব'লে তাদের নামাবলীর পাগড়িতে আমায় পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল চাপড় মেরে আধমরা করে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে ফেলে দিলে।

তারপর কী হল জানি নে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলেম বলা যায় না, কিন্তু খানিক পরে চোখ চেয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে গিয়ে দেখি, আমি কাশীতে! বললে বিশ্বাস যাবে না, আমার গা কিন্তু তখনো ভিজে ছিল, যেন সেই-মাত্র স্নান করে উঠেছি! কাশীর হিন্দু কালেজের ঘড়িতে তখন ঢঙ ঢঙ করে দুটো বাজল। একটা-উনপঞ্চাশ থেকে দুটো, এরই মধ্যে হরিদ্বারে গিয়ে কুম্ভস্নান, রাজ-দর্শন, কুল্‌কুচি, মার খাওয়া এবং পুনরায় কাশীতে ফিরে আসা, সমস্তটা স্বপ্নে দেখতে গেলেও এর চেয়ে ঢের সময় লাগত যে!

বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন 'বেটা, কুছ চোট লাগা?'

আমি একেবারে গদ্‌গদস্বরে বললেম, 'চোট লাগবে, বাবা! আপনার কৃপায় একটি আঁচড় কি একটি দাগ পর্যন্ত নেই, দেখুন।'

এবারে আমি খুব শক্ত করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক পা'ও নড়বার সাধ্য রইল না। ওঁর কাছে কিছু আদায় করে নেব, এই প্রতিজ্ঞা! আমার সম্বলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসাবাড়িখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতলায় একখানা ছোট ঘর, তারই সামনে একটু ছাদ। সেইখানে গুরুদেবের উপদেশ-মতো আমি যোগাসন প্রাণায়াম উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে দিলেম।

ফৌজের জমাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কমাদা, সবার যেমন রকম-রকম পোশাক, ইউনিভার্‌সিটির নানা ডিগ্রীর যেমন রঙ-বেরঙের ঘাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিদ্ধির তারতম্য-

হিসেবে রকম-রকম গেরুয়া আর রকম-রকম ফ্যাশনের কৌপীন, পাগ্ড়ি, জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তখন যোগ-সাধনের ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে বা ইন্‌ফ্যান্‌ট্রী দলে সবে ভর্তি হয়েছি। কাজেই আমার উর্দিটা হল সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি-কোর্তা, মাথায় সাদা পাগের লম্বা ল্যাজ আর সেই ল্যাজের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড়, হাতে বাঁশের ছড়ি, পায়ে খড়ম, গলায় তেঁতুলবিচির মালা, কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্তা-লুঙ্গি গেরুয়া হয়ে শেষে খালি গায়ের চামড়ায় গিয়ে পৌঁছতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু তিনিও অতদূর এখনো অগ্রসর হতে পারেন নি, কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না।

বাবার উপদেশ-মতো খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া উর্দি যত শীঘ্র পারি লাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলেম। ওদিকে বাবার সেবা করতে, সন্ন্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ সারতে, আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক মোড়ক হরিতালভস্মে ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভস্মটুকু দিয়ে বাবা বললেন, 'যাও, বাবা, এখন সংসারে ফিরে যাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।'

আপিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু, সে যে হল অনেকদিন। কাজ-গুলো আমার জন্যে এখনো বসে আছে কিনা জানি নে। তা ছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে মাত্র সেই হরিতালভস্মের মোড়ক। সেটাও সত্যি ভস্ম কিনা, তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তখন একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হল।

আমি হরিতালভস্মের মোড়ক বাবার কাছে বাঁধা রেখে ডাক-টিকিটের জন্যে দুটো পয়সা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বাবা, আমরা মুক্তির মন্ত্র সাধন করি, কোনো কিছু বাঁধা

রাখা তো আমাদের দ্বারা হতে পারে না। সন্ন্যাসী কি কখনো মহাজন হয়, বাবা?'

বাবার মধ্যে মহাজনি যে এতটুকু নেই, তাই দেখে ভক্তিতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমি 'বিফল জনম, বিফল জীবন' আর-একবার মনে মনে গাইতে গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিয়েছি, এমন সময় অনেকদিনের পর অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে, কোনো বদল হয় নি। কথায় কথায় জানলেম যে গয়ায় চলেছে— আমাদের জাহাজের সেই লেট্ সভার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যতরকম সভা আছে ও নেই, ব্রাহ্মণশূদ্রনির্বিশেষে সব-ক'টার পিণ্ডদান করতে। আমারও তখন পিণ্ডি দেবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করছিল, কিন্তু কার সেটা আর বলে কাজ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, গয়ার সাধু-সন্ন্যাসীদের খুশি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছ তো?'

অবিন হাতের মোটা লাঠিগাছা দেখিয়ে বললে, 'যথেষ্ট!'

কাশী থেকে গয়া কতদূরই বা? কিন্তু, সময় তো লাগছে অনেকটা! এই ভাবতে ভাবতে চলেছি, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামতেই অবিন চট করে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। একটা ঝড় হ'য়ে প্ল্যাট্‌ফরমের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা সাদা মোটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেঁপু দিচ্ছিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসল। মোটরখানা কোনো হোটেলের ভেবে আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, আমার এ বেশে তো হোটেলে ওঠা সম্ভব হবে না। কোনো ধর্মশালায় গিয়ে থাকলে হয় না?'

অবিন আমার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ধর্মশালা থেকে অনেক

দূরে এসে পড়েছি যে! এখনো বুঝি ওটার মায়া কাটাতে পার নি?'

বলতে বলতে গাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে মোড় নিয়ে দাঁড়াল। অবিন গাড়ি খুলে লাফিয়ে পড়ল। আমিও নামব, এমন সময় আমার পাগড়ির ল্যাজটা গেল মোটরের একটা চাবিতে বেধে! ল্যাজের গেরুয়া অংশ, তার সঙ্গে অনেকটা সাদা ফালিও, ভাড়ার উপর বখ্‌শিস হিসেবে গাড়োয়ানকে দিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করতে বসে গেলেম। অনেকগুলো সভা, পিণ্ডি তো কম দিতে হল না! সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেরে সূর্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, আমাদের বড়োবাজারের শ্রাদ্ধঘাটে বসে আছি। সেই সিঁড়ি, সেই মার্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে তেমনি মিন্‌টান্‌ টালির বাহার। আমি তো অবাক্। সন্দেহ হল যে, হরিদ্বারযাত্রাটার মতো এ যাত্রাটাও বুঝি-বা অতিশয় সত্যি!

অবিনের দিকে চাইলেম, তারও চেহারাটা কেমন ঝাপসা বোধ হল, যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি! কুয়াশাটা আমার মাথার ভিতরে কি বাইরে জমা হয়েছে, সেটা বুঝতে না পেরে আমি কাপড় ছেড়ে ব্রহ্মতেলোয় হাত বোলাচ্ছি, এমন সময় আমাদের জাহাজের বাবাজি এসে আমার সামনে 'জয় সত্যনারান' বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই ষোলো আনার এক আনা দেব বলে জেবে হাত দিতেই আমার হাতে ঠেকল সত্যনারানের কোনো কাজেই যেটা লাগবে না হরিতালভস্মের সেই মোড়ক— যেটা অবিনের চেয়ে, হরিদ্বারের চেয়ে, কাশী-গয়া, কলকাতার মোটরগাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর, বাবাজি, এমন-কি আমার নিজের চেয়েও সত্যি, সত্যি, সত্যি— সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়।

আটটা-উনপঞ্চাশের জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে পণ্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজি, এবং আরো প্রায় জন-পঞ্চাশ গিয়ে জাহাজের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয় শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয়, দখল করলেম।

টিকটিকি; গির্গিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া আলাপী, ঘাড়ে-চড়া বন্ধু, এক কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিদ্যেটা আংটি করে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে কোনখান থেকে আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল, সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

'অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে-অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি ক'রে রাঙ এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিদ্যের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোরপন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটাপথে অনেক ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি শহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়োমামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল, তা আর কী বলব! একবার এক কেরানি তার কাছে বাপ মরে ব'লে ছুটি চাইতে সে বললে কিনা, 'ইয়োর ফাদার হ্যাজ নো বিজ্নেস টু ডাই হোয়েন্ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন!' দেখো দেখি, বাপ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালোও ছিল। টুনি— সে বড়ো মজার সাহেব ছিল। ধুতি প'রে সে কালীপুজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখি শিকারে ভারি শখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে, পাখিটাকে মেরেই

আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে ! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাজ-কাটা টুন্‌টুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তার পর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে করে কোন্ বড়ো মিলিটারি পোস্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম্ গভর্মেণ্টকে পাঠায়। তখন চীনে-মিস্ত্রি আসত জাহাজে ক'রে, আমরা দেখেছি।— ওই বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দু ধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি হাতে তারা ঘুরে বেড়াত। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওইখানটায় ! ব্যাটারা যে জুতো বানাত, বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন', ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর, তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো শৌখিন ছিল না। ওই যেখানটায় এখন রিপন কালেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা সাদা চাঁপার গাছ ছিল ; তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা। শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হত। দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছ তো ? ওই তাঁরই ওস্তাদ ; তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিশনারিরা তাঁর ছিরামপুরের বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ। রামধন নামে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিল, তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারত না, বাপু ! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান করে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সব-প্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যাম-ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড়ো চটেছিল— চটবারই কথা !'

আমরাও কর্তার গল্পের বহর দেখে যে না-চটছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিশনারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্শ্বদের সঠিক জীবনবৃত্তান্তে এসে পৌঁছল। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে-মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়, মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাশি হয়েছে, এইরকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়ল, তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়োবাজার পৌঁচেছে।

আমি অবিনের গা টিপে বললেম, 'ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছি নে!'

'তার পর আংটিটার কী হল, কর্তা?' বলেই অবিন চোখ বুজলে।

গল্প চলল, 'লুকিবিদ্যে বড়ো সহজ বিদ্যে নয়! রাজা কেষ্টচন্দরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতে এই রসসাগরের লুকিবিদ্যের কথা লেখা আছে—'

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্ল্যাক হোল্ ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রূমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কী দিয়ে ভাত খেতেন, এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে করতে বড়োবাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলল— আংটির দিক দিয়েও গেল না! কর্তার শেষ বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে-খবর ঘুণাক্ষরে জানে না, এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে

এবং কাউকে বলতে মানা করে দিয়ে কর্তা ডাঙায় পা দিলেন।

আমি অবিনকে বললেম, 'ওহে, যথার্থই কর্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেল না!'

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বললে 'আমি ওইজন্যেই তো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্তা! নিজের খবর এঁর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে। পরের ছোটোখাটো ব্যবহারের জিনিস— চুরুট, দেশলাই, পান মায় তার ডিবে, এঁর পকেটে আপনি গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি গিয়ে হাতে ওঠে; পরের বিদ্যেয় ইনি পণ্ডিত; পরচর্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া-সাধক; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্তা— আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।'

সিন্ধু তীরে

মিশনারি বন্ধু আমার কোণার্ক যাত্রার নাম শুনিয়াই বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং কিঞ্চিৎ মুখভঙ্গীসহকারে বলিয়া উঠিলেন, 'সে স্থানে কী দর্শনীয় আছে!'

মিশনারিটি সেই ধরণের লোক, গির্জা তুলিয়া যাঁহারা জগবন্ধুর মন্দির দমাইতে উদ্যত, নাচ যাঁহাদের চক্ষুশূল, গান যাঁহাদের কাছে কুরুচি, কদম্বতরু অশ্লীল বৃক্ষ এবং কৃষ্ণলীলা তদপেক্ষা অধিক-কিছু! এরূপ বন্ধুর সহবাসও যে সময়ে সময়ে আমাদের অরুচিকর হইয়া পড়ে এবং যেটা তাঁহারা দর্শনীয় বলেন না সেটাই আমাদের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে, এটা আমার বন্ধুকে বুঝাইতে সময়ের বৃথা অপব্যয় না করিয়া আমি এবারে সত্যই কোণার্ক যাইবার আয়োজন করিলাম ঠিক সেইগুলাই দেখিতে, পাদরি সাহেবের মতে যেগুলা মোটেই দর্শনীয় নয়।

বছরকতক পূর্বে আমি পুরীর পত্রে শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। হোটেলে, মোটর-গাড়িতে, বৈদ্যুতিক আলোয় পুরী অন্ধকার হইয়াছে এবং সুরুচিসঙ্গত সাহেবি পিয়ানো-বাদ্যের টুংটাং ধ্বনিতে সাগরের কল্লোল চাপা পড়িয়াছে।

সুতরাং, মোগলাই জোব্বার উপরে প্রকাণ্ড একটা সাহেবি সোলা-টুপি চাপাইয়া, একগাছা মোটা লাঠি ও এক লণ্ঠন লইয়া, ছয়-ছয় পাল্‌কি-বেহারার সঙ্গে একেবারে পুব-মুখে দৌড় দিবার বন্দোবস্ত করিলাম— সুরুচির এবং ভদ্রতার কোনো দোহাই না মানিয়া। কিন্তু, যাত্রার পূর্বে মাথার উপরে একখণ্ড মেঘ এমন ঘনাইয়া আসিল যে মনে হইল, বুঝি-বা পাদরি সাহেবের অভিশাপ

ফলিয়া যায়!

আমাদের যাত্রার মুখে মেঘ কাটিয়া পঞ্চমীর চাঁদ প্রকাশ পাইয়াছে। অদূরে চক্রতীর্থ— বালুকাস্তূপের ধবলতার উপরে, আধুনিক হইতে দূরে, অতীতের একটি মরীচিকার মতো দেখা যাইতেছে।

চক্রতীর্থ পার হইয়া আর অধুনাতনও নাই, পুরাতনও নাই, রহিয়াছে কেবল চিরন্তন নীরবতা— অন্তহারা অস্ফুটতাকে আলিঙ্গন করিয়া। মানুষের পদশব্দ সেখানে লুপ্ত, সাগরগর্জন স্বপ্নের প্রায়— পাই কি না পাই। এই শূন্যতা এত বিরাট যে, চাঁদের আলো সেও সেখানে অন্ধকার ঠেকিতেছে। ছায়ার বৈষম্য দিয়া আলো'কে ফুটাইতে, প্রতিঘাত দিয়া শব্দকে জাগাইতে সেখানে কিছুই নাই! অথচ মনে হয় না যে একা! সঙ্গে ছয়-ছয় বেহারা চলিয়াছে বলিয়া নয়; কিন্তু এই প্রকাণ্ড শূন্যতা যে নির্জীব নহে, সেটা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি বলিয়া। এটা যে শ্মশান নয়, এখানেও যে বিরাট প্রাণের স্পন্দন অবাধে আমার চারি দিকে হিল্লোলিত, তাহা বেশ বুঝিতেছি। স্তব্ধ রাত্রি জুড়িয়া লক্ষকোটি কীটপতঙ্গের ঝিনি-ঝিনি দূরে অদূরে কাহাদের নূপুরশিঞ্জিনীর মতো তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে— তাহা কানে আসিতেছে না সত্য; অকূল অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের সাড়া পাইয়া হরিণের পাল ছুটিয়া চলিয়াছে— চোখে পড়িতেছে না বটে; কিন্তু, মন তাহার সহস্র পরিচয় পাইতেছে এবং আপনাকে নিঃসঙ্গ মানিতেছে না! লোকালয়ে নিজেকে অনেক সময় একাকী বোধ করিয়াছি, কিন্তু কোণার্ক-যাত্রার প্রথমেই এই-যে শিশুর মতো ধরিত্রীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ার আনন্দ, নিখিলের সহিত আপনাকে সঙ্গত জানার আনন্দ, ইহাতে প্রাণ যেন তুলিতে থাকে— মনেই আসে

না, একা চলিয়াছি। চলার আনন্দ! নিখিলের সহিত তুলিয়া চলার আনন্দ! শূন্যের মাঝ দিয়া উড়িয়া চলার আনন্দ! প্রদীপ নিভাইয়া আলোকের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভাসিয়া চলার আনন্দ!

চক্রতীর্থ হইতে বালুঘাই পর্যন্ত সমস্ত পথটা আনন্দের একটা জাগরণের মধ্য দিয়া যেন উড়িয়া আসিয়াছি। এইখানে আসিয়া প্রাণের দুয়ার সহসা যেন বন্ধ হইয়া গেছে— মন যেন আপনার দুই ডানা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে। নিশ্চল মেঘে চন্দ্রতারকা আচ্ছন্ন; নীরব অন্ধকারের মাঝে নিস্তরঙ্গ বায়ুরাশি; কোনো দিকে সাড়া-শব্দ নাই! মনে হইতেছে, এ কোথায় আসিলাম! কোন্ মৃত্যুর দেশে পায়ে পায়ে অর্ধরাত্রে আমরা এই কয় ক্ষুদ্র প্রাণী! এ সময়ে আলোর জন্য, ধ্বনির জন্য, অন্ধকারে কোথাও একটা-কিছুকে দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে। মন চাহিতেছে চলি, কিন্তু সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া গেছে!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাল্‌কি-বাহকদের করুণ ক্রন্দনগান শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। কোথায় চলিয়াছি, কেমন করিয়া চলিয়াছি, কেনই-বা চলিয়াছি, তাহা আর মনে আসিতেছে না। শুধু বোধ হইতেছে, যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গোলকের ভিতর দাঁড়াইয়া, একটি পাও অগ্রসর না হইয়া, আমরা কেবলই তালে তালে পা ফেলিতেছি— 'পহর-রাতি, পান-বিঁড়িটি! পান-বিঁড়িটি, পহর-রাতি!'

বালুঘাই পার হইয়া চলিয়াছি। পহর-রাতি পান-বিঁড়িটি এবং লণ্ঠনের বাতি, তিনে মিলিয়া মনকে ঘিরিয়া একটা যেন স্বপ্নের সৃজন করিয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা তালগাছ অন্ধকারের ভিতর দিয়া হঠাৎ চোখে পড়িয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাইতেছে!

চারি দিকে যেন একটা লুকোচুরির খেলা চলিতেছে ; মরীচিকার মায়া দেখা দিতেছে, ঢাকা পড়িতেছে। কাছে আসিতেছে সকলই— গাছ-পালা, গ্রাম-নদী। কিন্তু ধরিতে গেলেই সরিয়া পালাইতেছে ; কিছুই নিরাকৃত হইতে চাহিতেছে না !

দর্শন, আকর্ণন এবং নিরাকরণ— এ তিনের অভাবের মধ্যে নিয়াখিয়া নদীটি শীতল স্পর্শে আমাদের সমস্ত জড়তা দূর করিয়া আপনার স্বচ্ছ হাসির কল্লোলে যখন চকিতের মতো রাত্রির গভীরতাকে মুখরিত করিয়া তোলে, তখন প্রাণের দুয়ার সহসা যেন খুলিয়া যায় ; পাল্‌কি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি, অদূরে অন্ধকার বনের ছায়ায় ছোটো গ্রামখানি। মন এখান হইতে, এই চিরপরিচিত গৃহকোণকে ছাড়িয়া, এই নিয়াখিয়ার খেয়াঘাট পার হইয়া আর চলিতে চাহে না।

রাত্রিমুখ হইতে রাত্রিশেষের দিকে যাত্রার মধ্যপথে এই হাস্যময়ী কল্লোলিনী নিয়াখিয়া। এই মধ্যপথ অতিক্রম করিয়া মন কেবলই আলোকের জন্য, প্রভাতের জন্য, ব্যাকুল হইতে থাকে। কেবলই মনে হয়, আর কতদূর, আর কত প্রহর এমনি করিয়া অন্ধকারে চলিব !

অফুরান পথ চলার, প্রহরের পর প্রহর একটা বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়া বাহিত হইবার, সুবিপুল শ্রান্তি এই সময় আসিয়া মনকে এমন করিয়া আক্রমণ করে যে, সে কোনো দিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না ; আপনাকে গুটাইয়া-সুটাইয়া একটি কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেন বাঁচে !

ঘুমাইয়া পড়িবার, আপনাকে এই বিশ্বজোড়া বিলুপ্তির মধ্যে বিনা আপত্তিতে নামাইয়া দিবার জন্য দুর্দমনীয় খোঁয়ারি আসিয়াছে। যেন একটা শীতল মুষ্টি প্রাণের সমস্ত ইচ্ছাকে, জাগিয়া রহিবার সকল চেষ্টাকে, সবলে চাপিয়া অসাড় করিয়া দিতেছে। দারুণ

অবসাদ! দেখিতেছি, যাত্রীদল ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে ডাকিয়া শুধাইতে চাই পথ আর কতখানি, কিন্তু পারি না। কোষের মধ্যে কীটের মতো নিশ্চল মন, একটা খট্-খট্ ছাড়া আর কোনোরূপ সাড়া দিতেছে না! পাল্‌কির তলা দিয়া লণ্ঠনের আলো এবং বাহক-দের দ্রুত-চঞ্চল পদক্ষেপের ছায়া, আলো-আঁধারের স্রোতের মতো অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। চোখ এই আলো এবং কালো, কালো এবং আলোর গতাগতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।

রামচণ্ডীর বটচ্ছায়ায় পাল্‌কি নামাইয়া বাহকেরা কখন কে কোথায় সরিয়া গেছে। সমস্ত দেহ-মন একটা আগুনের উত্তাপ অনুভব করিতেছে এবং ধীরে ধীরে আপনাকে জড়তার নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া আবার সজাগ হইয়া বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে; কিন্তু পারিতেছে না। চারি দিক এমনি নীরব স্থির ও স্তিমিত যে মনে হইতেছে, একখানা প্রকাণ্ড দৃশ্যপটের ভিতরে তাহারা আমাকে রাখিয়া গিয়াছে! মন্দিরের পিছনে, আকাশের নীলের উপরে একটিমাত্র তারার জ্যোতি স্থির হইয়া আছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড বটগাছের শিখরে সামান্যমাত্র কম্পন নাই; তলদেশে পাতার গুচ্ছে, শাখার গায়ে, আগুনের রঙ হলুদের প্রলেপের মতো লাগিয়া আছে অচঞ্চল। আগুনের তপ্তকাঞ্চনবর্ণের সম্মুখে চক্রাকারে সজ্জিত মানুষের ছায়া সুতীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু, অবিরল, অবিকল, ছবির মতো।

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলাম; পাল্‌কিতে আসিয়া বসিলাম; বাহক আসিল; পাল্‌কি চলিল এত গভীর নীরবতার মাঝখানে যে মনে হইতে লাগিল, সেই সীমাচলে পৌঁছিয়াছি যেখানে বাস্তবে-অবাস্তবে স্থূলে-সূক্ষ্মে গলাগলি ভাব। নিজেই আছি কি না এ কথাটা জানিতে চারি দিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, কাঁটাবনের ঢালু

পথ বাহিয়া, পায়ে পায়ে সন্তর্পণে, একটা অচেনা অন্ধকারের দিকে পুনরায় যখন নামিয়া চলিয়াছি, সেই সময়ে সহসা খোল-করতাল ও সংকীর্তনের প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত বাস্তবকে আনিয়া মনের উপরে এমন করিয়া আছড়াইয়া ফেলিল যে মনে হইল, বুক বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল! অন্ধকারে হঠাৎ আলোর আঘাতে দৃষ্টি যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তেমনি সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে এই শব্দতরঙ্গের ঝন্ঝনায় প্রাণের তন্ত্রী বিদ্যুৎবেগে রন্রন্ করিয়াই শিথিল হইয়া পড়ে।

রামচণ্ডী, আমাদের যাত্রাপথের শেষ ঘাট, পিছনে ফেলিয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে এখানেও কীর্তনের সুর যেন কোন্ পরিত্যক্ত পার হইতে একটুখানি আক্ষেপের মতো আমাদের নিকটে পৌঁছিতেছে— অস্পষ্ট, মৃদু, ক্ষণে ক্ষণে! পাড়ি দিয়াছি যে-ঘাট হইতে তাহার সংবাদ এখনো পাইতেছি; পাড়ি দিতেছি যে-পারে তাহার সংবাদ এখনো পাই নাই; মাঝগঙ্গায় মন সমস্ত পাল তুলিয়া যেন মন্থরগতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে আলোকরাজ্যের সিংহদ্বারের দিকে।

প্রাতঃসন্ধ্যার ভরপুর অন্ধকার। তারার আলো নিভিয়া গেছে। প্রভাতের আলো, সে এখনো সুদূরে। এই সাড়াশব্দহীন ধূসরতার মাঝে ক্ষণেকের জন্য আমরা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি কাঁধ বদলাইতে।

হরিণ যেমন বহু পথ দৌড়িয়া হঠাৎ একবার উৎকর্ণ উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়ায়, তার পরে পথের ঠিকানা পাইয়া তীরের মতো সেই দিকে চলিয়া যায়, তেমনি আমরা উড়িয়া চলিয়াছি— সিন্ধুতীরের নিষ্কলুষ ধবলতার উপর দিয়া, একটা বিশাল গম্ভীর কল্লোলের মুখে, নির্ভয়ে, বাতাসে বুক ফুলাইয়া।

জ্যোতির্মন্দিরের সিংহদ্বার অতিক্রম করিতেছি। আলো গলিয়া

আমাদের পায়ের নীচে বিছাইয়া যাইতেছে, শব্দ গলিয়া আমাদের আশে-পাশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর কালো-সমুদ্রের সাদা-আলো মায়ার প্রাচীরের মতো অবিরাম চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতেছে!

রাত্রি চতুর্থ প্রহর। বিশ্বমন্দিরে উত্থান-আরতি বাজিতেছে; কালোর দুন্দুভি আলোর তালে ধ্বনিত হইতেছে দিকে দিগন্তে, সীমায় অসীমে! এই জ্যোতির্ময় ঝন্‌ঝনার ভিতর দিয়া, এই বিগলিত আলোকের চলায়মান শব্দায়মান আস্তরণের উপর দিয়া, দ্রুত-পদক্ষেপে ইহারা আমাকে লইয়া চলিয়াছে— বরুণদেবতার অনুচরগণের মতো, নীল, নগ্ন, দীর্ঘকায়! আলোকবিধৌত সিন্ধুতীরে ইহাদের পদক্ষেপ ছায়া ফেলিতেছে না, চিহ্ন রাখিতেছে না!

বালুতট ওদিকে গড়াইয়া চন্দ্রভাগার কোলে পড়িয়াছে, এদিকে গিয়া সমুদ্রজলে নিজেকে হারাইয়া দিয়াছে। রাত্রি— আলো-আঁধারের ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মরীচিকার পারে, প্রহরশেষের নিশ্চল ধূসরতা দিয়া গড়া নীরব এই বালুতটে আমাদের ক'টিকে আছড়াইয়া ফেলিয়া যেন বহুদূরে সরিয়া গেছে।

নূতন দিন জন্ম লইতেছে— অনাবৃত আলোকে, নীরবতার মাঝখানে, আনন্দময়ী উষার অঙ্কে। বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে! একাকী এই জন্মরহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটিমাত্র রক্তবিন্দু! পূর্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্বরাগের একটিমাত্র বুদ্‌বুদ— অখণ্ড, অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্ করিতেছে! জ্যোতির রথ, মহাদ্যুতি এই প্রাণবিন্দুটিকে বহিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে— সপ্তসিন্ধুর চলোর্মি ভেদ করিয়া, জাগরণের জ্যোতিষ্মান চক্রতলে সুষুপ্তিকে

নিষ্পেষিত করিয়া! পূর্ব-আকাশে এই শোণিতবিন্দুর আভা লাগিয়াছে, সমুদ্রতরঙ্গ বহিয়া তাহারই প্রভা গড়াইয়া আসিতেছে। পাণ্ডুর তটভূমি দেখিতে দেখিতে রক্তচন্দনের প্রলেপে প্লাবিত হইয়া গেল; রক্তবৃষ্টিতে চন্দ্রভাগার তীর্থজল রাঙিয়া উঠিল। মৈত্রবনের শিখরে কোণার্কমন্দিরের প্রত্যেক কোণ, প্রতি শিলাখণ্ড, আতপ্ত রক্তের সজীব প্রভা নিঃশেষে পান করিয়া অনঙ্গদেবতার উল্লসিত কেলিকদম্বের মতো প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মানুষের গড়া কোণার্কের এই বিচিত্র রথ দেখিতেছি— কত যেন ক্ষুদ্র! সূর্যের তেজ্ ধারণ করিয়া, তাহারই শক্তিতে ঊর্ধ্বে বাড়িয়া, আপনাকে চিরশ্যামল চিরশোভন রাখিয়াছে এই যে বনস্পতি, ইহারও ঊর্ধ্বে কোণার্কের রথধ্বজা উঠিয়া তিষ্ঠিতে পারে নাই— আপনার ভারে আপনি ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

জরাজীর্ণ বজ্রাহত এই মন্দিরের উপর হইতে অরুণোদয়ের রক্ত-আভার মোহ সরিয়া গেছে। দিনের প্রখর আলোয় সে তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া বনস্পতিটির আড়ালে আপনাকে যেন গোপন করিতে চাহিতেছে, মিলাইতে চাহিতেছে! দূর হইতে কোণার্কের এই হীন এবং দীন ভাব মনকে যেন লোহার মতো শক্ত করিয়া দিয়াছে। উহার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু তবু চলিয়াছি— চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া, অসমতল কালিয়াই গণ্ড পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া, মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণবশে চুম্বকের টানে লোহার মতো। মন টানিতেছে! ঐ বটচ্ছায়ায় মন টানিতেছে, ঐ চূড়াহীন মন্দিরের দিকে মন টানিতেছে, ঐ ঝরিয়া-পড়া ঝুঁকিয়া-পড়া বালুশয়ানে-শুইয়া-পড়া রাশি রাশি পাথরের দিকে মন টানিতেছে!

কোণার্কের বিরাট আকর্ষণে বাধা দেয় ঐ বনস্পতিটির শ্যাম

যবনিকা। সেটি সরাইয়া মৈত্রবনের ছায়ানিবিড় আশ্রমটি পার হইয়া যে-মুহূর্তে কোণার্কের অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে পা রাখিয়াছি অমনি দৃষ্টি মন সকলই অগ্নিশিখার চারি দিকে পতঙ্গের মতো, আপনাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শ্রান্ত করিয়া ফিরিতেছে— কিছুতে আর তৃপ্তি মানিতেছে না!

চিরযৌবনের হাট বসিয়াছে! চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কেলিকদম্বতলে নিখিলের রাসলীলা চলিয়াছে— কিবা রাত্রি, কিবা দিন— বিচিত্র বর্ণের প্রদীপ জ্বালাইয়া, মূর্তিহীন অনঙ্গদেবতার রত্নবেদীটি ঘিরিয়া।

এখানে কিছুই নীরব নাই, নিশ্চল নাই, অনুর্বর নাই! পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারি দিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানসশতদল— সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

এইবার ফিরিতেছি— উদয়ের পার হইতে আবার সেই অস্তের পারে; আর একবার সংসারের দিকে, সুরুচি-কুরুচি শ্লীল-অশ্লীলের দিকে।

কোণার্ক আমাদের নিকটে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্ধ-নিমগ্না পড়িয়া আছে সে পাষাণী অহল্যার মতো সুন্দরী— নীরব, নিস্পন্দ, মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্ত-জোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তরব্যাপী প্রতীক্ষার মতো; শতসহস্রের গমনা-গমনের এক প্রান্তে সুদুর্লভ একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী!

গিরিশিখরে

মায়ের পরশ! আলোয়-ধুলোয় লোকে-লোকাকীর্ণ শহরের কিনারা দিয়েই এই নির্মল পরশখানি একটুখানি নদীর বাতাস হয়ে বহে চলেছে। এপার থেকে ওপারে যাবার, পার থেকে ঘরে আসার, সেতুপথে চকিতের মতো এই পরশ— গঙ্গাজলে ধোয়া এই পরশ।

এই শান্ত সুস্নিগ্ধ পরশখানির এক পারে দেখছি পরিচিত পুরাতন দেশ, আর পারে দেখা যাচ্ছে প্রবাসবাসের সিংহদ্বার হিমরাত্রির-অন্ধকার-মাখা।

বিপুল জনস্রোতের সঙ্গে একত্রে ছুটে চলেছি, ঠেলে চলেছি, নিঃশব্দে, নীরবে ; আর নদীর উপর দিয়ে অবিশ্রান্ত বহে আসছে কাজল আকাশ, কালো জলের সমস্ত স্নেহ-মাখা মায়ের পরশ!

অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটা তীব্র বাঁশি দিগ্‌দিগন্তের সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে উঠল! আবার আলো, আবার ধুলো, আবার জনকোলাহল! এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবী-জোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি তখন কেবল শুনছি, পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা লৌহনির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

গাড়ির দুই সারি জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র দুই ফালি আস্‌মানি পর্দা, তার মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝকে এক-একটি তারা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না ; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আসছে, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা

গাছের ঝাপসা মূর্তি চোখের উপরে এসে আঘাত ক'রেই সরে যাচ্ছে।

বিরাট রাত্রির এই প্রকাণ্ড বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছি বললে ভুল হয়। নিশাচর পাখিরা রাত্রির নীরব নীলের মধ্যে আপনাদের নিশ্চল পাখা মেলে নিঃশব্দে যেমন ভেসে যায়, এ তেমন ক'রে যাওয়া নয়, এ যেন একটা উন্মত্ত দৈত্য চাকা-দেওয়া লোহার খাঁচায় আমাকে বন্ধ ক'রে পৃথিবীর উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে; তার চলার প্রচণ্ড বেগে লোহার খাঁচাটা পৃথিবীর বুক আঁচড়ে, চারি দিকে অগ্নিকণা ছিটিয়ে, অন্ধকুহরের ভিতর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।

সুদীর্ঘ অনিদ্রা, অফুরন্ত অস্থিরতা, তার পরে বিরাট অবসাদ! নির্জীব প্রাণ নিরুপায় অবোলা একটা জন্তুর মতো চুপ ক'রে পড়ে আছে, অপার অন্ধকারের মুখে দুই চোখ মেলে।

একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথবীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

পথিক যেমন পথ চলতে ক্ষণিকের মতো পথপ্রান্তে দেবতার দেউলটিতে একটি নমস্কার দিয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করে, আমরা তেমনি এই প্রাতঃসন্ধ্যাটিকে প্রণাম করেই যেন আবার অগ্রসর হচ্ছি।

একটা কূলকিনারা-হারা বালুচরের ঠিক আরম্ভে রাত্রি প্রভাত হয়েছে। আকাশের বর্ণ দূরে দূরে নদীর ক্ষীণ ধারাগুলিকে সুতীক্ষ্ণ ছুরির মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে পরিষ্কার ফিরোজার একটিমাত্র প্রলেপ; তার উপরে একঝাড় কুশ আর কাশ। নূতন সূর্যালোক কাশ-ফুলের শ্বেত-চামরের উপরে আবীর ছড়িয়ে সমস্ত ছবিটিকে রাঙিয়ে তুলেছে। নির্জন এই নদীর পার, নিঃশব্দ নিশ্চল এই নদীপারের বালুচর, এর ভিতর দিয়ে জলের ক্ষীণ ধারা আমাদেরই মতো মন্দগতিতে চলেছে।

নদী থেকে শত শত হাত ঊর্ধ্বে সেতুপথ বেয়ে চলেছি। একটি মৃদুমন্দ দোলা, গতির একটা শিহরণ মাত্র, এ ছাড়া আর-কিছু অনুভব হচ্ছে না। চলেছি, চলেছি, দিনের মন-ভোলানো সবুজের মাঝ দিয়ে রাতের ঘুম-পাড়ানো নীলের দিকে।

অশেষ পথ, সুদীর্ঘ প্রহর-পলের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত চলেছে। দিন ও রাত্রি এই পথের দুই ধারে নিরাবরণ ও আবরণের দুইখানি মায়াজাল রচনা করতে করতে আমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

বারাণসী— মন্দির-মঠের একটা প্রকাণ্ড অরণ্য! দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকে তার সমস্তটা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে— জনশূন্য স্নানের ঘাটে সোপানের কোলে কোলে নদীজলে বিজলীরেখাটি থেকে তপ্ত পথে নিঃশব্দে যে-যাত্রীরা চলেছে তাদের গাঢ় ছায়াটি পর্যন্ত। এ যেন একটা মায়াপুরীর দিকে চেয়ে রয়েছি! পাষাণপ্রাচীরগুলো থেকে একটা উত্তাপ মুখে এসে লাগছে; নাগরিকদের সমস্ত গতিবিধি কার্যকলাপ আমাদের চোখে পড়ছে স্পষ্ট; কিন্তু তাদের কোনো সাড়াশব্দ আমাদের কাছে পৌঁছতে পারছে না। এ যেন একটা মূকের রাজত্ব পেরিয়ে চলেছি। আর, শব্দের সীমার বাহিরে

তাদের এই প্রকাণ্ড নগরী ঊর্ধ্ব-আকাশে পাংশু দুটি পাষাণবাহু তুলে একটা ভাষাহীন নিবারণের মতো দূর-দূরান্তরের দিকে চেয়ে রয়েছে, দুইপ্রহর বেলার শব্দহীন আলোকের গায়ে চিত্রার্পিত।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপরে বেলাশেষের তাম্র আভা। আম্র-বনের ছায়ায় ছায়ায় রাত্রি আপনার আশঙ্কা নিয়ে এখনি দেখা দিয়েছে। বনরেখার উপরে অযোধ্যার শেষ নবাবের বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদের একটা অংশ আকাশের পরিষ্কার নীলের গায়ে শুষ্করক্তের গাঢ় একটা বিমলিন ছাপ ফেলেছে। বাঁধ-ভাঙা গোমতীর জল প্রকাণ্ড একটা ছিন্ন কন্থার মতো পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, অনেক দূর পর্যন্ত সমস্ত সবুজকে আচ্ছাদন ক'রে।

পশ্চিমদিগন্তব্যাপী শোণিমার নীরব একটি নির্ঝর আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে; রাতের পাখি এরই উপর দিয়ে কালো ডানা মেলে উড়ে আসছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে বৃষ্টি নেমেছে; পাহাড়ের হাওয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মুখে এসে লাগছে বরফের মতো। দূর-দূরান্তরে একটিমাত্র ঝিল্লি অন্ধকারে শব্দের একটা উৎস খুলে দিয়ে ক্রমান্বয়ে গেয়ে চলেছে। একটা পান্থশালার প্রদীপ জলে-ধোয়া পৃথিবীর মসৃণতার উপরে আপনার আলোটি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়ে অনিমেষে রাত্রির দিকে চেয়ে রয়েছে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারকে ধাক্কা দিতে দিতে গাড়ি চলেছে, হিমালয়ের যেদিক বেয়ে গঙ্গা নামছেন সেই দিক হয়ে।

এখানে মেঘ কেটে চাঁদ দেখা দিয়েছেন অন্ধকার গিরিশ্রেণীর চূড়ায়। অদূরে স্নানের ঘাট, নহবৎখানা, মন্দিরচূড়া, জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে; গঙ্গার বাতাস সমস্তটির উপরে স্নিগ্ধতা ঢেলে

দিয়েছে। আমাদের যাত্রাপথের শেষে, সুদীর্ঘ রাত্রির অন্তিম প্রহরে এই গঙ্গাদ্বার। এরই ওপারে সূর্যদেবের হরিতাশ্বসকল অপেক্ষা করছে, নূতনকে— অদৃষ্টপূর্বকে— জগতে বহন করে আনবার জন্য।

আরোহণ

রাজপুরের পান্থশালায়, হিমালয়ের ঠিক পায়ের কাছটিতে বসে বিশ্রাম করছি। বরফের বাতাস দিয়ে ধোয়া তরুণ প্রভাত, আকাশ-জোড়া পাহাড়ের কোলে ছোটো এই শহরের ঘরে ঘরে জাগরণের সোনার কাঠি স্পর্শ করে যাচ্ছে। দক্ষিণে একটি গিরিনদী, গোপন গুহা থেকে স্বচ্ছ ধারাটি তার উপলখণ্ডের উপর দিয়ে, পুষ্পিত কুঞ্জের ভিতর দিয়ে, নেমে এসেছে তরল কল্লোলে পৃথিবীর বুকের উপর। আর, বামে উঠে গেছে গিরিপথ পৃথিবী ছেড়ে ক্রমাগত আকাশের দিকে, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে, মেঘের অন্তরালে। এই আকাশের দিকে উঠে চলা, আর এই অনন্ত সাগরের দিকে নেমে আসা, এরই মাঝে মুহূর্তের বিশ্রাম এই পান্থশালার কুঞ্জতীরে।

পর্বতের নীলের ভিতরে প্রবেশ করছি। চোখ-জুড়ানো নীল অঞ্জন, ঘুম-পাড়ানো নীল রহস্য, এরই একটি স্নিগ্ধ আভা সমস্ত দিনটিকে, সকল পথটিকে, সুশীতল করেছে।

পাহাড়ের একটা বাঁক। মেঘ-ফাটা রৌদ্রে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, মাথায় এক বোঝা শুকনো ঘাস চাপিয়ে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ও ধারে ভীষণ একটা ভাঙন, পাহাড়ের গায়ে অগ্নিদাহের ক্ষতচিহ্নের মতো কালো দেখা যাচ্ছে। প্রখর রুদ্রমূর্তিতে দিগ্‌বিদিক্ এখানে দেখা দিয়েছে, যেন দুঃস্বপ্নহত। একটা নির্জীব ঘোড়া এরই মাঝ দিয়ে এক-রাশ পাথর বহে চলেছে পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা একটা রাজ-অট্টালিকার দিকে।

এ পাহাড়ের আর-একটা বাঁক। বনতরুর ঘন পল্লবের তলায় ছায়া, একখানি নীড়ের মতো, পায়ের তলা থেকে মাথার উপর

পর্যন্ত ঘিরে নিয়েছে। চিররাত্রি এখানে অবগুণ্ঠন টেনে কোলের মধ্যে ঝরা পাতা, নব কিশলয়, জীবন-মরণ, সবাইকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন নির্জনে মেঘরাজের গোপন অন্তঃপুরে।

পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করছি। দুই ধারে উপবন, তারই মাঝ দিয়ে পথ; জনমানব নেই, কিন্তু সমস্ত যেন কারা সযত্নে সুমার্জিত করে রেখেছে! সুবিন্যস্ত তরুশ্রেণী, সুশ্যাম সুচারু তৃণভূমি; তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পার্বতীমন্দির— সুধাধবল। এরই উপরে পাহাড়ের নীলের কূলকিনারা-হারা একটিমাত্র গভীর প্রলেপ বর্ষার মেঘের মতো আকাশ ঢেকে রয়েছে। এই কালোর উপরে আলো নিয়ে শোভা পাচ্ছে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির বিদ্যুতের মতো। দেখতে দেখতে কুয়াশা এসে সমস্ত দৃশ্যটি মুছে দিয়ে গেল; অনাবিল শুভ্রতার কোলে ফুটে উঠল সোনার ফুলে সাজানো একটিমাত্র কর্ণিকার।

মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কুয়াশার সুবিমল শিশিরচুম্বন মুখে লাগছে, চোখে লাগছে, প্রাণের ভিতর পর্যন্ত স্পর্শ করছে পথের ক্লেশ-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে।

পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতাপাতার ভিতর থেকে একটা জলপ্রপাত নেমেছে; তারই উপরে অপরিসর সেতু ছত্রাকে-ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছে। একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারই তীরে বনদেবীটির মতো বনলতা পুঞ্জ পুঞ্জ তারাফুলের একটিমাত্র গুচ্ছ। জলের হাওয়ায় কাঁপছে কচি পাখির ডানা-দুখানির মতো দুটি লতাবল্লরী; আর তারই পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে। ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক! অনেকখানি জুড়ে দূরে দূরে পর্বতে পর্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য করে

চলে যাওয়ার, এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝনৎকার!

মেঘরাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্মোকের মতো একখণ্ড কুয়াশা সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। নীচে একটা সুদীর্ঘ কালো ছায়া পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্যন্ত লতিয়ে উঠেছে; আর উপরে একটা সবুজ উচ্ছ্বাস নীল আকাশে তরঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। ঐখানে, নির্মেঘ ঐ নীলের বুকে, শরতের সুতীক্ষ্ণ হাওয়ায়, কোন্ দেবদারুবনের ছায়ায় আমাদের এবারের নীড়, মন যেখানে উড়ে যেতে চাচ্ছে এখনি অর্ধপথের পান্থশালা ছেড়ে।

পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ; এক দিকে খাড়া পাথরের দেয়াল, আর-এক দিকে অতলস্পর্শ শূন্য। অনেক দূরে, যেন একটা প্রকাণ্ড হ্রদের পরপারে, ধূসর গিরিশ্রেণী দেখতে পাচ্ছি। একখণ্ড মেঘ শূন্যের উপরে সাদা পাল তুলে ধীরে ধীরে চলেছে, বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে পর্বতের এক-একটা মোড় নেবার সময় এই শূন্যের উপর দিয়ে খেয়া দিতে দিতে চলেছে আমার এই জীর্ণ কাঠের দোলাখানি। পাথর আপনার অটুট পরমায়ু, লতাপাতা আপনাদের ক্ষণিকের জীবন-যৌবন নিয়ে এই শূন্যতার একেবারে তীরে এসে প্রতীক্ষা করছে ঝরে যাবার জন্য, খসে যাবার জন্য। এইখানে একটি পাখির গান! অদূরে বনের নিবিড় ছায়া থেকে সে ক্রমান্বয়ে বলছে— পিয়া-পিয়া পিউ-পিউ।

শুষ্ক নদীর খাতের মতো ঊষর একটা গিরিসংকট; তারই মোহড়ায় একটা লোক সরকারি আপিসে বসে যত লোকের কাছে চুঙ্গি আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা বুভুক্ষিত কুকুর এইখানের চারি দিকে মাটি শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্বতের সুনীল ছায়া, সমস্ত শোভা, এই শুষ্ক ভূমিটাকে ছেড়ে দেখছি অনেক দূরে পিছিয়ে

গেছে। এ যেন আকাশের উপরে একটা রাশীকৃত পাথর আর ধুলার মরুভূমি! এরই পরে বনের নীলের মধ্যে আর-একবার অবগাহন। সেখানে পায়ের তলায় পাহাড় ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের ভিতরে গড়িয়ে গেছে। দিন সেখানে যেতে পারে নি; কেবলমাত্র কেলুবনের শিখরে শিখরে পূর্ব-সন্ধ্যার একটু ধূসর জ্যোতি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সূর্যদেব এখন মধ্যগগনে বিরাজ করছেন, কিন্তু এই বনরাজির তলায় শিশিরসিক্ত ঝরা পাতার বিছানায় এখনো রাত্রি। ঝিল্লিরবের ঘুম-পাড়ানো স্বর এখানে বাজছেই, কিবা রাত্রি, কিবা দিন।

পুরাতন অরণ্যানীর নিষুপ্তির মধ্যে এই একটিমাত্র ডুব দিয়েই পথ একেবারে জনতা, সভ্যতা, কর্মকোলাহলের মাঝখানে গিয়ে মাথা তুলেছে!

একটা মানুষ এখানে কর্কশ গলায় চীৎকার করে কেবল ডাকছে, 'ফাল্‌তো, ফাল্‌তো, এ ফাল্‌তো! এরে বেকার কুলি!'

সভ্যতার এই প্রবেশদ্বারেই এক দিকে রয়েছে দেখি 'ওল্ড ব্রুয়ারি' বা পুরাতন মদের ভাটি; আর-এক দিকে কতকগুলা দোকান-ঘর— সেখানে একটা দর্জি, সে বসে কাপড় ছাঁটছে, আর একটা টেবিলের সামনে সোডা লেমনেড্ হুইস্‌কির বোতল সাজিয়ে হোটেলওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ক্রমাগত চোখকে পীড়া দিচ্ছে টিনের ছাদ, পোস্ট-আপিস, রয়েল-হোটেল, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড, সাহেবদের হ্যাট-কোট, একটা মাড়োয়ারি রাজার ক্যাসেল এবং পর্বতের গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা নিলাম কন্‌সার্ট ও স্কেটিং-রিঙের বিজ্ঞাপনী। বাহকেরা যখন দেখিয়ে দিলে আমাদের বাসাটা অনেক দূরে আর-একটা পর্বতের শিখরদেশে, তখন মনটা যেন

সুস্থির হল।

দুর্গম দুরারোহ গিরিপথ উচ্চ হতে উচ্চ হয়ে বন্ধুর একটা গিরি-সংকটে গিয়ে প্রবেশ করেছে ; তারই শেষে পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে, হাট-বাজারের অনেক উর্ধ্বে, পাখির বুকের পালকের মতো শুভ্র সুকোমল মেঘে ঘেরা শরতের আমার এবারের বাসা— ফুলে-ঢাকা পর্বতের একটা বিশাল অলিন্দের একটি কোণে গোলাপলতা আর মল্লিকাঝাড়ের পাশাপাশি।

আমাদের সেখানে আর এ পাহাড়ের ঋতুপর্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায় শীতের আগেই দিগ্‌বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা, এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলি-ফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টানতে টানতে, ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে উঠছে বসন্তে, বসন্ত খিন্ন হতে হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ঝিক্‌মিক্ করতে করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে— এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি— এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নীহারিকার গর্ভে বাস করছি। দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল; রাত আসছে অঞ্জনশিলার মতো হিম, অন্ধকার।

আমার চারি দিকে সবেমাত্র দশ-বিশ হাত পৃথিবী গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে, যেন অগোচরের কোলে এক-টুকরো জগৎ; আর, আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারি দিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেন নি— সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু একটু দেগে রেখেছেন,

অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই-যে পরিচয়ের পূর্বমুহূর্তে কুয়াশার যবনিকাটি দুলছে, এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান, একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে। এই কথাটাই এক-গোছা সবুজ পাতা আমার জানলার কাচের বাহিরে কেবলই ঘা দিয়ে দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির পর একটি দূত— চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোটো একটি মৌমাছি— তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো অন্ধকারের দিকে মুখ করে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপ্‌টায় বাজিয়ে তুলে মস্ত একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রিশেষে বর্ষা দিগ্‌বধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ-আভা দেখা যাচ্ছে। আর, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ-সীমা পর্যন্ত; আর রঙও নেই, রূপও নেই।! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটিমাত্র পাহাড়ি ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে। প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাপড়িগুলি, এত ছোটো, এত কচি— একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরিশিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে, নীহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে

এসেছে পর্বতের কলভাষী তুরন্ত শিশু এই-যে জলধারা— এর ঝরে পড়ার মধ্যে।

কাঁচা সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরির বুকের পালকের অফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব-প্রথম তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্তদিনের, তরুণ দিনের, প্রথম আশীর্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর করকা। আর তারই আভা তুষারের সহস্র ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে এক-ঝাড় পাহাড়-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি, আর আমি। এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান, ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মতো নিশ্চল নির্বাক আমাকে বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক, তাদের দেখি ওঠা-নামা চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরেজি বাদ্য, গোরার নাচ, সেই-সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে— হয় ঘোড়ার পিঠে নয়তো নিজের পায়ে তুইজোড়া চাকা বেঁধে। মাড়োয়ারি রাজার ফরাসি-ধরণের বৈঠকখানার চুড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবলই ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে; ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না।

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড়ো, তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য উদয় হন আর যে-পিঠে তিনি অস্তে যান, এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচুনিচু একটা পথ; এই পথ দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে— মাসের মধ্যে ত্রিশ না হোক, ঊনত্রিশ দিন তো বটেই— এই পথটিতেই সকালের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি শ্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা, আর পর্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য; প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ং-সন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিম্‌ঝিম্ যা শুনছি কি বোধ করছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে— 'সাধারণ সড়ক নয়। অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে।' পর্বতের কোলে এই 'সাইন্'টা আমাকে প্রথম দিন বড়োই ভয় দিয়েছিল। কিন্তু, সন্ধানে জানলেম, যারা এই কয়েদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই। এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেক দিন ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ নীচে স্কুলবাড়ি কুয়োখানা প্রভৃতির গা ঘেঁষে আর-একটা ঘুরুনে রাস্তা— সার্‌কুলার রোড— ক্লব-ঘর ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড ও বাজার পর্যন্ত, জিলাপির পাকের ধরণে রচনা করে নিয়েছে। সুতরাং এ রাস্তাটার ভবিষ্যতেও পথ হয়ে ওঠবার কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল; মানুষের কাজে লেগে পথ হয়ে ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটল না।

অনেকদিন আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম গা বেয়ে প্রথমটা সে

ঠিক পশ্চিম মুখে সুন্দর বাঁক নিতে নিতে 'সহস্রধারা'র উপত্যকার দিকে কাত হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নীচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে। একটু দূরে গিয়েই হঠাৎ পর্বতের পুবের দেয়াল ঘেঁষে আবার পশ্চিমে দৌড়। সেখানে একদল মহিষ চোখ রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই, পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে, সোজা আকাশের দিকে উঠেই, সহসা মোড় নিয়ে পর্বতের পূর্বগায়ে দিগন্ত-জোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারুবনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে। এই দিকটাতে সে শৈবালকোমল নির্ঝর-শীতল পর্বতের বাঁকে বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্বতের পুব পিঠে আর-একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে টিন্-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জি কোট সেলাই করছেন; রাস্তার এক পাশে কাদের এক-গাড়ি জ্বালানি কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে; হতভাগা-চেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাঁধা পান্‌সির মতো কাত হয়ে পড়েছে। এই পর্যন্তই বিপথের দৌড়। বাকি যেটুকু অতিক্রম ক'রে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয়, সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই। মানুষ সেটাকে পর্বতশিখর পর্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে, সেখানে কোনো যানও যান্ না, পাও চান্ না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাস্টার, নয় তো ধর্মপ্রচারক। তার বুলিই হচ্ছে, 'এইবার পথে এসো!' নয় তো সে বলছে, 'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই-যে রোড— সেন্ট

ভিন্‌সেণ্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেণ্ট মহোদয়ের রাস্তা— এখানে নিরালা একটুও নেই ; মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চোর-কাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্‌সন্‌ভোগী এক কাবুলি আমিরের নূতনবয়ঃপ্রাপ্ত দুই-চারি বংশধর, যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরি পাজামা ও ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুইবেলা আমার গা ঘেঁষেই বলাবলি করে চলেছে, 'আজব টোপি ! আজব চোগা !' আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ ; দুইটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু, আজবের সংগ্রহ এ গরিবের চেয়ে আমির-পুত্র-কয়টির অনেক বেশি ছিল। সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরি-ভ্রমণের নোট নিচ্ছেন। তিনিও দেখলেম, আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই চট্‌ ক'রে খাতায় কী-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধু ছাড়া আর কারুর হাতে পড়ছে না। যাই হোক, এইরকম সব ছোটো-খাটো উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড সোলার টুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনির কোট-প্যাণ্ট পরিধান করে বিচরণ করে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছে না বটে, কিন্তু মানুষের উল্টো পিঠের জীব যারা তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে— কী পথে কী বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই কি বিপথে, চলি কি না চলি— এই দো-টানার মধ্যে যখন আমি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় কোনোরকমে পথ-বিপথ

দুইয়েরই মান রেখে দিনযাপন করছি, সেই সময় দেখি, পর্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ প'রে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। 'ফুলন ফুলত ভার ভার!' যত পাতা তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল— পাথরের বুকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়— সূর্যের উদয়-অস্তের যত রঙ, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে। ঋতুরাজের বাঁশির ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রঙটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম ক'রে গিরিশিখর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাত রঙের পিচ্‌কারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর সন্ধ্যার কুঙ্কুমে, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুই বেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্তবাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজিরা দিচ্ছি, একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিস্ট। আজ কদিন ধরে আমার যাবার-আসবার পথ আগ্‌লে হিমালয়ের একটা দৃশ্যপট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আল্‌পনা টেনে যাচ্ছেন— মনেই ধরা যায় না, সে এমন বিচিত্র। এক টুক্‌রো সাদা কাগজে এরই নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিস্ট!

উপহাসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেল না। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে কুয়াশায় ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্রকারিণীর রঙ তুলি কাগজপত্র

উড়িয়ে নিয়ে, অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রঙ-মেশাবার জল-পাত্রটি পর্যন্ত উল্‌টে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিস্টের কতকগুলো ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্‌-একটা পাহাড়ে শিল্পপ্রদর্শনী খুলেছে। যিনি কবি, যিনি কর্মী, তিনি ঐ নীল আকাশপটে আলো-অন্ধকারের টান দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন; আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে একটা-একটা জাল দলিল প্রস্তুত ক'রে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড়ো করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি নির্লজ্জভাবে।

মানুষ সে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান ক'রে তুলতে হবে। মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার ক'রে বিশ-হাত দশ-মুণ্ডু অথবা বিধাতার গড়া নরনারী-মূর্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্‌, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না। কিন্তু, তুষারপর্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে চলে যেতে চায়, সেটাকে আমরা কী বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দুজনকেই অপমান করতে থাকে।

•

আমার এ বাগানে ফুল আর ধরছে না। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা— তাদের আঁচল নেই— খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে, কিন্তু ফুলের মকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না ক'রেই নিতান্ত ছেলেমানুষি-বশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা গেছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি, তার বড়ো বড়ো দুটো চোখ চারি দিককে কেবলই প্রশ্ন করছে সকাতরে, কী তার অপরাধ জানতে। গোরু-বাছুরের উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান ক'রেই যেন, সাহেব পুলিশের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন; সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই, এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার ক'রে মার্জনাভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেম।

এমনি ক'রেই নির্বিবাদে পর্বতে পর্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে পর্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণশিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য করে খেলা করে চলেছে, তারই মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মতো ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল আকাশে দিবা রাত্রি নিক্ষেপ করছে। এক দিকে হিমালয়, আর-এক দিকে সহস্রধারার উপত্যকা —যেখানে সূর্য-উদয় এবং যেখানে সূর্যের অস্তগমন— এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে ব'সে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন করে লাগে না। সূর্যের আলোতে ঝরা পাতার কস্ ধরেছে। তুষারের সাদা দিনে দিনে নীল আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মতো পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেক দূর পর্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান দিয়ে দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনি রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটিমাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টানছে শুনি— উঃ উঃ!

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে-আসার পথ চেয়ে পর্বতের চারি দিকে কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি, ঠিক সহস্রধারার উপত্যকার মুখে— পর্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে গুল্মে, লতায় পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধুলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মানিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মনে হচ্ছে, যেন তুষারের হৃদয়রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম দুয়ারের সোপানে আল্‌পনার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এরই উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যাতারার মতো একটি বনবিহঙ্গী— আলোয়-গড়া মোনাল পাখি সে— চলে গেল পায়ে পায়ে গিরিশিখর অতিক্রম করে চাঁদনি রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম, তুষারের শিখরে চাঁদ উঠছে আলোর একটা সুকোমলচ্ছটা আকাশে বিকীর্ণ করে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি, এ পাহাড়ের এক ভিখারি আমার জন্যে তার শরৎকালের উপহারটি রেখে গেছে— এক-গোছা সোনালি কুশ আর কাশ। সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়ে ছিল, চলে

যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ ক'রে কনকচূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে।

ভেঙে-পড়া দেবদারুর নির্যাসগন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বন-বেড়ালের ছাল নিয়ে— গহন বন থেকে মোনাল পাখির সোনার পাখা আর মৌচাকের সোনালি মধু চুরি ক'রে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াশার লেশমাত্র নেই; দিন রাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরিমাটির একটা রঙ লেগেছে।

পার্বতী রুক্ষ রক্তবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি-একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে, যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো— এরই উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির পর একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা করে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি। পর্বতে পর্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা করে আলোর ফুল্‌কি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে; আর, নীল আকাশে দীপালি-উৎসব ক্রমেই দেখছি জমে উঠছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা শুরু হয়েছে; পুজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্বত খালি করে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা— দেশী বিদেশী নির্বিশেষে— তার মুরগির ঝুড়ি, আধ-পোড়া হাঁড়ি, ছিট-মোড়া ময়লা বিছানা,

দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপ-ধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে-ক'টা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল, বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে, আবার চলে গেল দূর-দূরান্তরে, আকাশপথে দলে দলে— কী সুন্দর, কী স্বাধীন এদের গতিবিধি। আর, মানুষ যে জলে স্থলে আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার করলে তার যাওয়ায় কী অশোভনতা। সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মতো সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি, বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না ; আর, মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন-কি রাস্তার কাঁকরগুলো পর্যন্ত সংগ্রহ করে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্বতে পর্বতে পথ হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ করে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্রসূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে এ-কয়দিন আমার অন্তরে বাহিরে সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে

ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় করে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে— ফুলেরই মতো, পাতারই মতো। পর্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড়ো করে তুলেছে ; অটুট এদের প্রাণ !

আর, মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেইসব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালীরা, দেখছি, আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাঁচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে, শুকনো ঘাসের রক্ষাকবচ তাদের সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষি— যখন খেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্বত যেখানে খেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা ; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, বরফ পড়ল ব'লে ! কাল আমাদের যেতে হবে ; কালো মেঘের ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

আমি পর্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি। ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপসা কালো-কালো

পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে— চোখের সামনেই দাঁড়িয়েছে যেন। এ বাগানটা যাদের তারা চলে গেছে ; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপরে খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগল।

কাঁচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান শৌখিন ফুলের গাছ, জাল দিয়ে ঘেরা ; টেনিস্ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে এক হাত বরফ সেবারে পড়েছিল ; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্বতের উপর আসতে পারে ; ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে ; বাড়ির এই দিকটা পুরানো আর ঐ দিকটে সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে। ইত্যাদি।

অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বললে, 'ঐ যে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার ; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল, বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে ; আমি ছোটোবেলায় সেই বাগান দেখেছি।'

মালী যেদিক দেখালে সেদিকে তুষারপর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরই ধারটিতে সেই ভাঙা বাংলা ; ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষারপর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে— ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল, গাঁটে গাঁটে ফুল— পর্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুল্‌বুল্ নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডেকেছে শূন্যতার ঐ ওপার থেকে!